হিমালয় দুহিতার উষ্ণতায়

হিমালয় দুহিতার উষ্ণতায়

সালমান আল-আযামী

অর্পণ
আমার আদরের মামণি ‘নাবা’-কে

কিছু কথা

চরিত্রগতভাবে আমি ভ্রমণবিলাসী। পড়াশোনার জন্য আমি যখন ভারতে অবস্থান করি (১৯৯০-১৯৯৫), তখন ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়তাম বিচিত্র দেশ ভারতের বৈচিত্র্যময় শোভা দেখতে। ১৯৯৩ সালের অক্টোবরে এমনই এক সুযোগে দেশ থেকে আসা দু'বন্ধু দিপু ও কেনেডি ভাইকে নিয়ে বেড়িয়ে আসলাম দার্জিলিং ও নেপাল।

ভ্রমণকাহিনী লিখতে প্রথম উদ্বুদ্ধ হই সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' বইটি পড়ে। তারপর বুলবুল সারওয়ারের 'ঝিলাম নদীর দেশে' ভ্রমণকাহিনীটি আমার আগ্রহ তীব্রতর করে। খুঁজতে থাকি এমন একটি জায়গা, যার বর্ণনা দিতে গিয়ে আমি আমার আবেগের সাথে একাকার হতে পারব। দার্জিলিং ও নেপাল ভ্রমণে গিয়ে সেই জায়গার সন্ধান পেলাম। কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব সৌন্দর্য আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করল একটি ভ্রমণকাহিনী লিখতে। ভ্রমণশেষে যখন আলীগড় ফিরলাম, তখন বাংলাদেশী বন্ধুরা খুবই উৎসাহ দিল এ বিষয়ে লিখতে। তাদের আগ্রহ এতটাই ছিল যে, এক পৃষ্ঠা লিখা হলেই তাদের মাঝে কাড়াকাড়ি লেগে যেত পড়ার জন্য।

এভাবেই লিখা শেষ করে শীতকালীন ছুটিতে দেশে ফিরলাম। শ্রদ্ধেয় কবি মতিউর রহমান মল্লিক জানতে পারলেন এ পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে। দাবি করে বসলেন, তাঁর 'মাসিক কলম'-এ ছাপতে দেওয়ার জন্য। মল্লিক ভাইকে 'না' বলার স্পর্ধা আমার নেই। আর তাই 'কলম' পত্রিকায় ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল আমার 'হিমালয় দুহিতার উষ্ণতায়'।

১৯৯৫ সালের নভেম্বরে মাস্টার্স শেষ করে দেশে ফিরলাম। কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শে ভ্রমণ কাহিনীটি গ্রন্থকারে প্রকাশের জন্য দু'একজন প্রকাশকের সাথে কথা বললাম। কিন্তু আমার মতো অজ্ঞাত লেখকের বই প্রকাশ করে অর্থ বিনষ্ট করতে রাজি হলেন না কেউই। আমিও উপলব্ধি করলাম আমার পক্ষে প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ধরনা দেওয়াও সম্ভব হবে না আর আমার বইও প্রকাশিত হবে না। সুতরাং ওসব চিন্তা একরকম বাদই দিলাম।

২০০১ সালে এক পিকনিকে হঠাৎ পরিচয় হয় কামিয়াব প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী হেলাল উদ্দীনের সাথে। প্রসঙ্গক্রমে নানা আলোচনার মধ্যে আমার ভ্রমণকাহিনীর কথা উঠে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তাব দেন

বইটি বের করার জন্য। আর এভাবেই হেলালের ঐকান্তিক ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত লেখাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়।

১৯৯৪ সালে লেখাটি 'কলম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ২০০১ সালে এটি গ্রন্থাকারে বের হয়। বইটি এখন আর বাজারে নেই। ১৯৯৩ সালের সেই ভ্রমনের প্রায় ২৭ বছর পর এর পাণ্ডুলিপি আমার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হচ্ছে। এত বছরে অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটেছে। তথাপি মুল লেখার মাঝে ছন্দপতন অবাঞ্ছনীয় মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবেই পাণ্ডুলিপিতে কোন পরিবর্তন আনিনি। তাছাড়া আমি ও আমার দুই ভ্রমণসঙ্গীর অবস্থানের পরিবর্তন ছাড়া আর সবকিছু প্রায় একই রকম আছে। এদিকে আমরা তিন অবিবাহিত যুবকই এখন সাংসারিক জগতে প্রবেশ করেছি। আমি প্রতিশ্র"তি অনুযায়ী আমার জীবনসঙ্গিনীর সাথে আমার প্রথম প্রেমের পরিচয় করিয়ে এনেছি। মিটফোর্ড থেকে পাশ করা ডাক্তার দিপু আমার ছোটবেলার বন্ধু। সে এখন ইংল্যেন্ডে চাকুরী করে। আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। তবে কেনেডি ভাই কোথায় আছেন জানিনা। সর্বশেষ জানামতে কম্পিউটার প্রশিক্ষক কেনেডি ভাই তখনো কম্পিউটার নিয়েই ছিলেন। জীবনসঙ্গিনী হিসেবে তিনি তাকেই বেছে নিয়েছেন, যার ইঙ্গিত এ বইটিতে দেওয়া আছে।

বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি কামিয়াব প্রকাশন ও এর স্বত্বাধিকারী দুই ভাই নিজাম উদ্দিন ও হেলাল উদ্দীনকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। ধন্যবদ জানাই আমার অতি প্রিয় একজন মানুষ মরহুম কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাইকে তাঁর 'কলম' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লেখাটি প্রকাশ করার জন্য। আর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁর সময়কার দুই বাংলার শ্রেষ্ঠতম কবি মরহুম আল মাহমুদকে। অসুস্থ্যতার মধ্যেও তিনি আগ্রহ নিয়ে আমার পাণ্ডুলিপিখানা পড়েছেন এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি সেই সব পাঠক-পাঠিকাদের, যারা 'কলম'-এ আমার লেখাটি পাঠ করে আমাকে অভিনন্দন পাঠিয়েছেন সেই সুদূর আলীগড়ে। সম্প্রতি আমার এক ফেসবুক লাইভে এই ভ্রমন কাহিনীর অংশবিশেষ পড়ে শুনিয়েছি। অনেকেই পছন্দ করেছেন। আল্লাহ সবাইকে এর জন্য পুরস্কৃত করুন। আর সর্বোপরি মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট মাথানত করি, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের জন্য।

বইটি পড়ে যদি আপনাদের ভাল লাগে তবে আমার মতো অতি সাধারণ লেখক খুবই অনুপ্রাণিত হবে।

সালমান আল-আযামী
ম্যাঞ্চেস্টার, ইউ কে
আগস্ট ২০২০

যাত্রা হল শুরু

সকাল থেকেই পেটটা খারাপ। বৈশাখী মেঘের মতোই বারে বারে গর্জে উঠছে পেটের ভেতরটা। মাঝে মধ্যে এমন মোচড় দিচ্ছে যে মনে হচ্ছে আমার পেটটি একটি ফুটবল এবং বাইশজন খেলোয়াড় অনবরত লাথি মেরে যাচ্ছে তাকে। এর সাথে বাথরুমে ঘন ঘন গমন তো আছেই।

এই রোগটি আমায় পেয়ে বসেছে '৯১ সাল থেকে। টাইফয়েডে সেবার আমি যাই যাই। আমার আব্বা-আম্মাসহ বহু লোকের চোখের পানিকে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না মহান সৃষ্টিকর্তা। ফিরিয়ে দিলেন আমাকে। কিন্তু পেটের ভেতর রয়ে গেল একটা ফুটো। বহু কষ্টে তাই শরীরটাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। অতি সাবধানে খাবার মেনুর ভারসাম্য বজায় রাখি। বেশি তেল, ঘি, ভাজা খাওয়া চলবে না। বাইরের খাবার খাওয়া যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু জিহবার করুণ আহবান অগ্রাহ্য করতে পারি না প্রায়ই। আর তাই এবারের মতো অঘটন ঘটে যায় অহরহ।

অন্য সময় হলে তেমন ঘাবড়াতাম না। কিন্তু আজ রাতে যে আমার ৩৬ ঘন্টার ট্রেন ভ্রমণ শুরু হবে। তাও একা! পথে কিছু হলে? সবকিছু ভেবে বেশ দমে গেলাম। এমন সময় আসল ইমরান।

৫ ফুট ৭ ইঞ্চির মতো উচ্চতা। হালকা-পাতলা গড়ন। মুখমণ্ডল লম্বাটে। ঈর্ষণীয় ফর্সা গায়ের রং। মুখে এক টুকরা চিরস্থায়ী হাসি। মাথায় ক্যাপ। হাতে ছোট্ট নোটখাতা ও কলম ... আলীগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আপনি এতটুকু বললেই ইমরানের নাম মুখে মুখে শুনতে পাবেন। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'প্রবাস বন্ধু' আব্দুর রহমান না হলেও 'ইনি হরফুনমৌলা' বা সকল কাজের কাজী নামে ইমরানকে নিঃসন্দেহে অভিহিত করা যায়। এমন একটি চমৎকার ছেলে যদি এমন দুঃসময়ে এসে হাজির হয় তখন কেমন লাগে? প্রচণ্ড বেগের পর বাথরুম সারলে যেমন লাগে তার চাইতে কম কি?

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে বেশি সময় নিলো না ইমরান। দশ মিনিট পর রিক্সায় চেপে বসলাম। আলীগড়ে হাতেগোনা ক'জন ভাল ডাক্তারের মধ্যে আসিম রিজভী একজন। সব সময় রোগীদের ভীড় থাকে সেখানে। তাঁর কাছেই গেলাম। আল্লাহর রহমতে আর ডা. রিজভীর উসিলায় সন্ধ্যার মধ্যেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলাম।

১২.৩০ মিনিটে ট্রেন, শিয়ালদহ এক্সপ্রেস। টুয়েলভ্ ডাউন হিসেবেই বেশি পরিচিত। ট্রেন একটি বটে। কচ্ছপের গতিতে চলে। প্রতি স্টেশনে না থামলেই নয়। তার উপর আছে পথে পথে চেন টানা ও প্রচণ্ড ভীড়ের যন্ত্রণা। ৩৬ ঘন্টার সংগ্রাম করে যখন কোলকাতা পৌঁছবেন, তখন নিজের চেহারার দিকে তাকাতে পারবেন না। আপনাকে দেখেই তখন বোঝা যাবে কেন আপনি তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশের একজন নাগরিক।

সন্ধ্যার পরই ছেলেরা সব আসতে শুরু করল। খাজা, তুষার, দুর্জয়, রোমেল, তৈমুর, টিপু আরো অনেকে। তাছাড়া আমার উপরতলার সোহেল, আপেল ও মাহমুদ তো আছেই। 'সালমান ভাইয়ের নাকি অসুখ?' 'এই শরীর নিয়ে কিভাবে যাবেন? 'না হয় যাওয়া cancel-ই করে দেন'.... ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু না গিয়ে উপায় আছে? দীপু এসে কোলকাতায় বসে থাকবে। কেনেডি ভাইও তো এসে পড়বেন। সুতরাং আল্লাহর উপর ভরসা করে রওয়ানা হলাম স্টেশনের পথে।

ঐতিহ্য বজায় রেখে টুয়েলভ্ ডাউন দেরীতে এলো। পৌনে দু'টায়। আমাকে বিদায় দিতে এসেছে ইমরান, সোহেল ও রোমেল। ইমরানের কথাতো আগেই বলেছি। সোহেল আমার উপর তলায় থাকে। ছোট থাকতেই ওকে চিনি আমি। প্রতিভাবান ছেলে সন্দেহ নেই। এবারে নবাগত ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতে গিয়ে রীতিমত 'হিরো' বরে গিয়েছে। ঢাকায় শিশু একোডেমীতে নাটক পরিচালনা করে এসেছে। আবৃত্তিও ভাল করে। ছেলেও ভাল, তবে পরিপাটি জীবন যাকে বলে ঠিক সেভাবে চলাটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। 'চলছে চলুক না' এই রীতিতেই সে বিশ্বাসী। তৃতীয় জন ছিল রোমেল। আলীগড়ে তিন জন রোমেল আছে। এদের বন্ধুরা তিনজনকে তিন নাম দিয়েছে। প্রথম জন 'A' অর্থাৎ আঁতেল। দ্বিতীয় জন 'B' অর্থাৎ 'বিকম'। আমাদের রোমেলটি হচ্ছে 'C' অর্থাৎ 'চাপাবাজ'। তবে ছেলেটি খুব ভাল। ছাত্রও ভাল। সব সময় মজা করতে ভালবাসে। মজা করে কোন অনুষ্ঠান করা হবে আর রোমেল থাকবে না, তা ভাবাই যায় না। দুষ্টুমি বুদ্ধিতে মাথা ঠাসা। এই তো ক'দিন আগে একজনের বিদায় অনুষ্ঠান মাৎ করে দিল রোমেল ও সোহেল। সুতরাং বুঝতেই পারছেন। দু'ঘন্টা কেন ট্রেন পাঁচ ঘন্টা 'লেট' করলেও খারাপ লাগত না।

ট্রেন আসতেই চেপে বসলাম। রিজার্ভেশন আছে। সুতরাং ভাবনা কি? কিন্তু একি? আমার সিটে শুয়ে আছেন একন মহিলা। পাশের

ভদ্রলোক বললেন, 'ভাইসাব, থোড়াসা এডজাস্ট কি জিয়ে।' মেজাজটাই খিচড়ে গেল। আবারো এডজাস্ট? এই 'এডজাস্ট' শব্দটিও টুয়েলভ্ ডাউন যেন এক সুত্রে গাঁথা। আপনি বিহার রাজ্য দিয়ে চলছেন। হিন্দুস্তানের অন্যতম সভ্য [?] রাজ্য এই বিহার। এখানে প্রতি স্টেশনে বিচিত্র সব মনুষ্য প্রাণী উঠবে। যদিও রিজার্ভেশন কামরায় সকলের ওঠা বারণ। কিন্তু তাতে কি? ওসব নিয়ম যেন বিহারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। অন্য কোন ট্রেন হলে কথা ছিল। এযে টুয়েলভ্ ডাউন। এ ক্ষেত্রে 'কাজীর গরু কিতাবে আছে, গোয়ালে নেই।' তা না হয় উঠল। তো দাঁড়িয়েই থাক বাবা। না। আপনাকে চাপাতে চাপাতে একপ্রান্তে ঠেলে দেবে। বলবে 'থোড়া এডজাস্ট' করতে। এই 'থোড়া' এক সময় 'বড়া' রূপ ধারণ করবে এবং কিছুক্ষণ পরই আপনি নিজেকে আবিস্কার করবেন দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়।

তাই 'এডজাস্ট' শব্দটি শুনেই ক্ষেপে গিয়েছিলাম। কিন্তু একটু আত্মস্থ হতেই বুঝলাম, এখানে sequence ভিন্ন। এক বাঙালি ভদ্রলোকের বৃদ্ধা মাসী শুয়ে আছেন আমার সিটে। কিছুক্ষুণের মধ্যেই টিটির সাথে আলাপ করে পাশের সিটে আমার শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন ভদ্রলোক। বুঝলাম, বাঙালিদের 'এডজাস্ট' বিহারীদের মতো এতটা মারাত্মক নয়। আর দেরি করলাম না। শুয়ে পড়তে না পড়তেই চলে গেলাম স্বপ্নের রাজ্যে।

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৩। রোজ শুক্রবার। স্থান কাজী আলাউদ্দিন রোড। 'হাজীর বিরিয়ানী' খাচ্ছি আমি আর দিপু। পরদিন তিন মাস ছুটি কাটিয়ে ফিরে যাব আলীগড়। তাই দীপু খাওয়াতে নিয়ে এল। খেতে খেতে বললাম,

'নেপাল যেতে খুব ইচ্ছে করছে। এতদিন ধরে ভারতে আছি। একবারও সুযোগটা নিলাম না।'

দীপু বলল, 'আরে, আমিও তো নেপালে যেতে চাই, পার্টনার খুঁজছি।'

'যাবি?'

'অবশ্যই! কবে যাবি?'

'অক্টোবরে চল।'

'১৫ অক্টোবর আমার পরীক্ষা। তারপরই চল।'

'কনফার্ম?'

'কনফার্ম'।

পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হলো। ২০ অক্টোবর আমি আলীগড় থেকে কোলকাতা যাব। দীপু ঐদিনই ঢাকা থেকে পৌঁছবে কোলকাতা। সেখান থেকে আমরা প্রথমে দার্জিলিং তারপর নেপাল যাব। নেপালে দীপুর দাদা আছেন। কাঠমুণ্ডুতে WHO-এর প্রতিনিধি। তাছাড়া তাঁর দু'জন বন্ধুও আছে। সুতরাং ভ্রমণটা ভালই হবে বলে মনে হচ্ছিল। তবে এতটা ভাল হবে আশা করিনি। সে কথায় পরে আসছি।

১৯ অক্টোবর। সকালের মিষ্টি রোদ আমার চোখে এসে পড়ল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সকাল ৭টা। আমি কোথায় আছি? কয়েক সেকেন্ড সময় নিলাম বুঝে নিতে। এদিকে ট্রেন ছুটে চলেছে বেশ দ্রুত গতিতে। টুয়েলভ্ ডাউনের জন্য একটু অস্বাভাবিক বৈ কি। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি সবাই ঘুমোচ্ছে। ট্রেন চলছে সামনের দিকে। আর আমি ফিরে গেলাম পেছনে। 'হাজীর বিরিয়ানী' খাওয়া থেকে শুরু করে গতরাতে ট্রেনে ওঠা পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ একে একে ধরা দিতে লাগল আমার স্মৃতিতে। বর্তমানে ফিরে এসে একটু ভাবুক বনে গেলাম। মনে পড়ে গেল Carpenters -এর গানের দুটো কলি:

"Everything I want the world to be

Is now coming true especially for me!"

সত্যিই তাই! কোথায় নেপাল যাবার স্বপ্ন, দার্জিলিং যাবার জন্য আগ্রহ। আজ সত্যি সত্যি সে স্বপ্ন সফল করার জন্য এগিয়ে চলেছি। আল্লাহ কত সুখেই না রেখেছেন। আবার উল্টোটাও ভাবলাম। যদি দীপু না আসে? দিল্লী থেকে কেনেডি ভাই-এর আসার কথা। উনিও যদি আসতে না পারেন? তবে কি করবো? একা একা নেপাল যাবার দুঃসাহস করব? তাই বা কিভাবে হবে? আমার বাসা থেকে দীপুর টাকা আনার কথা। এছাড়া তো যাওয়া সবস্তই না। মনে হয় আলীগড়ে 'ব্যাক টু দি প্যাভিলিয়ন' ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। ধ্যাৎ! এতসব ভেবে কি লাভ? সময়ই বলে দেবে সব প্রশ্নের উত্তর! সময়ের হাতেই তাই এসব চিন্তা ন্যাস্ত করলাম।

সকালের উৎফুল্ল ভাবটা দূর হতে বেশি সময় লাগল না। পানিহীন নোংরা বাথরুম, প্রতি স্টেশনে অহেতুক দেরী করা, বিহারীদের অসহ্য আচরণ সবকিছু আমার সুখানুভুতিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল। কোন দুঃখে যে এ ট্রেনে উঠলাম? মনে মনে খুব একচোট দিলাম দিপুকে। ব্যাটা আর কিছুদিন আগে confiirm করলে কি হতো? তা হলে কালকা অথবা ডিলাক্সের টিকিট পেতাম।

বাঙালি ভদ্রলোকটি অবশ্য এর মধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। নাম মৃণাল কান্তি সরকার। দিল্লীতে একটি ঔষুধ কোম্পানিতে চাকরি করেন। ইংরেজিতে এমএ করেছেন পঞ্চাশোর্ধ ভদ্রলোকটি। আমি ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্র শুনে যেন উৎসাহিত হলেন। বিভিন্ন প্রশ্ন করে আমার জ্ঞানসীমা অন্বেষণে সচেষ্টা হলেন। অবশ্য বেশিরভাগ প্রশ্নই সাহিত্য বিষয়ক। এই রোগটি অনেকেরই আছে। বিদ্যা জাহির করার সুযোগ পেলেই সক্রেটিস, প্ল্যাটো বনে যাবার সাধ জাগে। এমনিতেই বিধ্বস্ত প্রায়। তার উপর শেক্সপ্রিয়ার-মিল্টন নিয়ে তত্তকথা কার ভাল লাগে? প্রসঙ্গ পাল্টাতে বললাম। 'দাদা, ক্রিকেট পছন্দ করেন?'

'হা' বা 'না' কিছুই বললেন না। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। বুঝতে পারলাম। প্রশ্নটি মনঃপূত হয়নি তার। এক প্রকার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েই বললেন,

'ওসব বড়লোকের খেয়াল আমার আগ্রহ নেই।'

বাঙালির ক্রিকেটে আগ্রহ নেই? বিস্মিত হলাম বৈ কি! কোলকাতার বাবুরা যেখানে স্বপ্নে ক্রিকেটে খেলেন আর ভারতীয় টেস্ট দলে বাংলার প্রতিনিধিত্ব নেই বলে উঠতে বসতে আফসোস করেন, সেখানে আমার সম্মুখে বসা ভদ্রলোকটি বলেন কিনা এটি 'বড়লোকের খেলা?' বোঝার বাকি রইল না, এই বাবুটি সাহিত্য বই আর ঔষধের নাম মুখস্থ করতে করতেই জীবনের চৌদ্দ আনা পার করে দিয়েছেন।

পরদিন সকাল দশটায় শিয়ালদহ পৌঁছলাম। নামার আগে ট্রেনে আয়নায় একটু চেহারাটা দেখে নিলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। নিজেকে মনে হলো সোমালিয়া অথবা ইথিওপিয়ার নাগরিক। গায়ের রং আমার বেশ কাল। অবশ্য এমনিতে আমাকে 'শ্যামলা' বলা যায়। কিন্তু আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় আমি রীতিমত কৃষ্ণাঙ্গ। ভাবলাম এ অবস্থায় যদি আমি আম্মার সামনে হাজির হই তবে বেচারী আমাকে নির্ঘাত 'ভূত' ভেবে একটা হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে ফেলবেন। 'টুয়েলভ্ ডাউন! সব তোমারই অবদান! বেঁচে থাক বাবা... বেঁচে থাক!'

বেলা ১টা হবে। পরিশ্রান্ত দেহ আমার গভীর নিদ্রায় অচেতন। ঠক! ঠক! ঠক! ঘুমের ঘোরেই দরজা খুললাম। জিনসের প্যান্ট সার্ট পরিহিত ছ'ফুট উচ্চতার সদা উৎফুল এক যুবক আমার সামনে দাঁড়িয়ে। সে আর কেউ নয়, আমার ছোটবেলার বন্ধু ডা. হোসেন ওরফে দিপু। শুধু বন্ধুই নয় প্রতিবেশীও। আমি আলীগড়ে আসার পর থেকে সে-ই আমার লিয়াজো অফিসারের দায়িত্ব পালন করে। অর্থাৎ আমার খোঁজ খবর

সবাই তার কাছ থেকেই পায়। একটা চিজ বটে! কেমন চিজ সেটা পাঠক ক্রমেই টের পাবেন। শুধু এটুকু বলে রাখি, এমন একজন না থাকলে ভ্রমণের আনন্দ অর্ধেকই মাটি।

দেশ থেকে এসেছে। চিঠি এনেছে অনেকেরই। আম্মা, আদনান, বাবু, শোভন, রিপন, বায়েজিদ ও মোশতাকের লেখা চিঠিগুলো পড়তে পড়তেই বেলা প্রায় গড়িয়ে গেল। ওদিকে দিপুও খাওয়া-দাওয়া সেরে একু জিরিয়ে নিয়েছে। বিকেলে একটু বের হলাম। কিন্তু টেনশন যাচ্ছে না। আমাদের তৃতীয় পার্টনার কেনেডি ভাই। বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশনের যুগ্ম-সম্পাদক তিনি। আর তাই দিল্লীতে একটি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দলের সহকারী কোচ হিসেবে এসেছেন। আজই তাঁর নিউ সিটি লজে আমাদের সাথে মিলিত হবার কথা। কেনেডি ভাই এলেন রাত ১০টার পর। প্রথম পরিচয়েই লোকটাকে দারুণ পছন্দ হলো।

আমাদের প্রথম টার্গেট দার্জিলিং। সে উদ্দেশ্যেই সকালে গেলাম ফেয়ারলী প্রেস রেলওয়ে রিজার্ভেশন কাউন্টারে। সেখানে পাসপোর্ট দেখলে পর্যটকদের বিশেষ কোটা থেকে সুবিধানজক টিকেট পাওয়া যায়। সাধারণ কাউন্টার থেকে এক-দেড় মাসের মধ্যে কোন রিজার্ভেশন পাওয়া যায় না বিশ্বের বৃহত্তম রেলওয়ে নেটওয়ার্কের দেশ ভারতে।

দার্জিলিং যেতে হলে প্রথমে যেতে হয় শিলিগুড়িতে। সেখান থেকে বাসে অথবা 'টয় ট্রেনে' দার্জিলিং যেতে হয়। আমরা সে রাতেই টিকেট পেয়ে গেলাম। হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি। শিলিগুড়ি শহরের রেলস্টেশন এটি। তাছাড়া আমার আলীগড় ফেরত যাবার জন্য 'কালকা মেলে'র একটি টিকেটও করে ফেললাম। এসেছিতো টুয়েলভ্ ডাউনে। এ লাইনের সবচাইতে খারাপ ট্রেনগুলোর একটি এই ট্রেনটি। সবচেয়ে ভাল ট্রেন হচ্ছে রাজধানী এক্সপ্রেস। ১৭ ঘন্টায় পৌছে দেবে। ভাল খাবারও দেবে। পুরো ট্রেনটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু টিকেটের দাম চড়া হওয়ায় ও আলীগড়ে স্টপেজ না থাকায় এ ট্রেনে আমাদের যাতায়াত খুবই কম। আর দুটি ট্রেন হলো কালকা মেল ও ডিলাক্স। কলকাতা ও দিল্লী থেকে ট্রেন দুটো সকালে ও বিকেলে ছাড়ে। ২৪ ঘন্টা লাগে। ট্রেন দুটো বেশ ভাল। নিয়ম-কানুনও এখানে বেশ শক্তভাবে প্রয়োগ করা হয়। আমরা সাধারণত এ দুটি ট্রেনের একটিতেই যাতায়াত করি।

কথা ছিল কেনেডি ভাই স্কেটিং দলের সদস্যদের দেশের পথে রওয়ানা করিয়ে দিয়ে সাড়ে ১২টার মধ্যে পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ হাই

কমিশনের রিসেপশনে আমাদের জন্য বসে থাকবেন। কিন্তু আমি সেখানে পৌনে তিনটা পর্যন্ত বসে থেকেও তার নাগাল পেলাম না। ওদিকে তিন ঘন্টা পর ট্রেন। উনি না এলে তো আমাদেরও যাওয়া হবে না। সব পরিকল্পনা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। আল্লাহকে ডাকতে থাকলাম। পরে ঘুরে এসে দেখি বেচারা দাঁড়িয়ে আছেন কাচুমাচু হয়ে। সবাইকে বিদায় দিতে দিতে দেরি হয়ে গেছে।

পৌনে ছ'টায় আমাদের ট্রেন। তার আধঘন্টা আগেই পৌছে গেলাম হাওড়াতে। ট্রেন ছাড়তে ছাড়তে সোয়া ছ'টা বাজিয়ে দিল। ট্রেন ছাড়ার প্রায় সাথে সাথেই গান শুরু হয়ে গেল। গান গাওয়ার প্রতি কেনেডি ভাইয়ের প্রচণ্ড আগ্রহ। দীপু তার গানের বেশ ভক্ত। এমনিতে তাঁর গলা খারাপ না। যে কোন আসর জামানোর জন্য যথেষ্ট ভাল। তবে over-enthusiastic যাকে বলে উনি অনেকটা তাই। সে কারণেই প্রায় সব গানই উঁচু স্কেলে ধরেন তিনি। ভাল গান গাইতে না পারলেও গানের স্কেল সম্পর্কে আমার মোটামুটি ধারণা আছে। সে সূত্রেই আমাদের ভ্রমণে প্রায়ই আমাকে তাঁর গানের স্কেল ঠিক করে দিতে হতো।

আমাদের পুরো ভ্রমণে দুটো গানকে আমরা 'ভ্রমণ সঙ্গীত' হিসেবে ঠিক করি। প্রতিটি যাত্রার প্রথমেই এ দুটো গান গাওয়া হবেই। প্রথমটি একটি রোমান্টিক গান। গানের প্রথম ক'টি কলি হচ্ছে:

"জাব কোই বাত বিগাড় জায়ে
জাব কোই মুশকিল পার জায়ে
তুম দেনা সাথ মেরা ও হাম নাওয়া!
না কোই হ্যায়, না কোই থা
জিন্দেগী মে তুমহারি সিওয়া
তুম দেনা সাথ মেরা ও হাম নাওয়া।!"

কথাগুলো যদিও প্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য করে বলা, তবে আমরা যাকে উদ্দেশ্য করে গেয়েছি তিনিই হচ্ছেন সবচাইতে প্রিয়তম হবার যোগ্য - মহান প্রভু, আমাদের প্রতিপালক। আর তার নির্দেশে যে মাটিতে আমাদের জন্ম সেই জন্মভূমিকে নিয়েই ছিল আমাদের দ্বিতীয় 'ভ্রমণ সঙ্গীত'। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই গানটি হচ্ছে :

'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা

ওসে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সেদেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

তাছাড়া আরও কত গান। কেনেডি ভাইয়ের গান কমই মুখস্থ। সেক্ষেত্রে আমি তাঁর ত্রাণকর্তা হিসেবে এগিয়ে আসি। এভাবেই কম্পার্টমেন্ট গরম করে তুললাম আমরা। ক্রমেই অন্যান্য যাত্রীরাও আমাদের সাথে তাল মেলাতে লাগলো। আমাদের উল্টো দিকের ভদ্রলোকতো চমৎকার কটা গান গাইলেন। তাঁর গলাও বেশ দরাজ। হিন্দি ছবির গান থেকে শুরু করে ভজন পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ল না। এভাবে অনেক রাত পর্যন্ত চলল আমাদের সঙ্গীত সাধনা। এরপর খেয়ে দেয়ে যখন শুয়ে পড়লাম, তখন আমাদের কল্পনাগুলো যেন একত্র হয়ে ডানা মেলে উড়ে গেল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' পর্বত শৃঙ্গে যেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল এক অপরূপ দৃশ্য।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেন যখন থামল, তখন ঘড়ির কাটা ১০টা ছোঁয় ছোঁয়। ওখান থেকেই 'টয় ট্রেন' যায় দার্জিলিং। সময় থাকলে ওতে করে যেতাম। নয় ঘণ্টা ধরে উপভোগ করতাম প্রকৃতির অপূর্ব রূপ। আমাদের দেশে শিশু পার্কের ভেতর যারা ট্রেনে চড়েছেন এই টয় ট্রেনটি সে রকমই। রেল লাইনগুলো ছোট, যাকে বলা হয় 'স্মল গেজ'। কাশ্মীর ছাড়া ভারতের প্রায় সব হিল স্টেশনেই এই টয় ট্রেনে করে যাওয়া যায়। এতে উঁচুতে বড় ট্রেন উঠতে পারেনা বলেই এই ব্যবস্থা। ধীরে ধীরে আপনাকে নিয়ে উঠে যাবে এই ট্রেন হাজার হাজার ফুট উপরে। মনে হবে আপনি কোন পঙ্খীরাজের পিঠে চড়ে চলেছেন স্বর্গের দেশে।

আমাদের তিন সদস্যবিশিষ্ট ক্ষুদ্র দলটির দলনেতা বেসরকারিভাবে আমাকেই নির্বাচিত করা হয়। কারণ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বদৌলতে বছরের ৯ মাস আমি এদেশে কাটাই। এর ফলে অনেকের 'ভারতীয়' সম্বোধনটিও মাঝে মাঝে 'হজম' করতে হয়। নেতৃত্ব লাভের জন্য এর চেয়ে বড় গুণাবলি আর কি হতে পারে? তবে আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দিব্যি নিজের প্রস্তাবগুলো একে একে পাশ করিয়ে নিয়েছে দিপু। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের ভাই ভরত যেমন রামের পাদুকা পরে দিব্যি ১৪ বছর দেশ শাসন করে গেছেন, অনেকটা তেমনিভাবেই আমাকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে আমার ভ্রাতৃতুল্য বন্ধুটি সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছে একের পর এক। তবে ব্রাকেটে একটা কথা বলতেই হচ্ছে, দিপুর

অধিকাংশ প্রস্তাবই ছিল পাশ হবার মতো। তবে সেকথা সবাইকে বললে আমার নেতাগিরি শিকোয় উঠবে। তাই শুধু আপনাকেই জানালাম। দয়া করে ব্যাপারটা ফাঁস করে দেবেন না।

আমি টয় ট্রেনে যেতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু দিপু বাধা সাধলো। 'যেখানে বাসে মাত্র তিন ঘন্টা লাগে, সেখানে নয় ঘন্টার ট্রেন জার্নির কোন মানে হয় না,' আমি ইন্টার্নির মধ্যে এসেছি, আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে', 'সময়ের অনেক দাম' ইত্যাদি কথার ফুলঝুরি ছুটল। মনে পড়ে গেল পৌনে দু'বছর আগের কথা। সেবার উত্তর ভারত ঘুরতে বেরিয়েছি আমি, দিপু, আবিদ ও মোশতাক। আবিদ ও মোশতাক বেশ ধীরগতিতে সব কাজ করে। আমি মাঝারি পর্যায়ের। আর দিপুর যেন সবকিছুতেই তাড়া। ঐ ভ্রমণে প্রায়ই সে একটা কথা বলতো 'Hurry up, don't waste time'। এবার সে কথাটি বলা থেকে সচেতনভাবে বিরত থেকেছে মিটফোর্ড থেকে সদ্য পাশ করা ডাক্তার দিপু। বঙ্গানুবাদ করে এবার বলছে, 'তাড়াতাড়ি'! তবে যত যাই হোক, এই 'তাড়াতাড়ি'-এর আর্শীবাদেই অত্যন্ত সময়ানুবর্তীতার সাথে আমরা আমাদের ভ্রমণ শেষ করতে পেরেছিলাম।

কিন্তু তিন ঘন্টার কম জার্নির জন্য কয়েক ঘন্টা কাটাতে হলো শিলিগুড়িতে। দুর্গাপূজা চলছে। সুতরাং প্রচণ্ড ভীড়। দার্জিলিংগামী পর্যকটদের ৮০%ই বাঙালি। সত্যি বাঙালিরা ভ্রমণ করতে জানে। তাদের কোথায় না দেখেছি? কাশ্মীরে 'শালীমারবাগ' বাগানে বসে আছি আমি আর আমার মামতো ভাই নজীব। আমাদের বাংলা শুনেই এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদারা কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন?' কেরালায় ঘুরছি বন্ধুর সাথে। কানে ভেসে এলো, 'মাসীমা, জলটা দিন তো।' উটিতে গিয়ে দেখি সালমান খাঁন ও মাধুরী দীক্ষিতের ফিল্ম শুটিং হচ্ছে। এক দিদি'র চিৎকার কান ঝালাপালা হয়ে গেল, 'ওমা! এযে দেখছি সালমান খাঁন!' সত্যি, জাতে কৃপণ হলেও ভ্রমণে এরা ওস্তাদ। আপনাকে ঘরে ডেকে নিয়ে দুটো বাতাসা দিয়ে বলবে, 'দাদা, পুরোটাই খেতে হবে কিন্তু।' আর এ সামান্য আতিথেয়তার বদৌলতে যে অর্থটা সাশ্রয় হবে, তাই এরা কাজে লাগাবে ভ্রমণের পেছনে।

বহু কষ্টে, এদিক সেদিক দৌড়িয়ে, 'রৌদ্র স্নান' করে শেষ পর্যন্ত যখন দার্জিলিং যাবার জন্য মিনিবাসে উঠলাম, তখন বাজে আড়াইটা। শুরু হলো আমাদের ভ্রমণের মূল পর্ব দার্জিলিং যাত্রা। শিলিগুড়ির কয়েক ঘন্টার পরিশ্রম যেন ক্রমেই দূর হয়ে গেল! বাস উঠছে উপরের দিকে।

আর নীচে পড়ে যাচ্ছে আমাদের যত ক্লান্তি অবসাদ। নিসর্গের এরূপ যারা দেখেন নি তারা কল্পনাও করতে পারবেন না এ দৃশ্য। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে থাকা অপূর্ব কারুকাজ দেখে অজান্তে গেয়ে উঠলাম:

"ঐ নিসর্গের বাঁকে বাঁকে
মন যে আমার পড়েই থাকে
তোমার কারুকাজেরও মেলায়
বাকহারা হই, রই যে চুপ।"

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। অন্ধকার নেমে এলো। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এতই মগ্ন ছিলাম যে টেরই পাইনি বাস কখন জামে আটকে গেছে। শিলিগুড়ি দার্জিলিং হাইওয়ের বেশির ভাগ রাস্তাই ওয়ানওয়ে। তাই ট্রাফিক জাম এ রাস্তায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। ওদিকে নামাজের সময় প্রায় যায় যায়। বাসেই নামাজ আদায় করলাম। লক্ষ্য করলাম, নামাজের প্রতি দীপুর আন্তরিকতা অনেক বেড়েছে। খুবই খুশি হলাম এতে। এদিকে তাপমাত্রা ক্রমেই নীচের দিকে যাচ্ছে। মেঘের রাজ্যে আছি আমরা। শীত তো লাগবেই। গায়ে শীতের কাপড় জড়ালাম। বহুক্ষণ চুপ ছিলেন কেনেডি ভাই। আর বসে থাকতে পারলেন না। যথারীতি 'ভ্রমণ সঙ্গীত' দুটো হলো। এরপর কেনেডি ভাই ধরলেন :

"ইয়ে বাহার ক্যাহ রাহি হ্যায়
ইয়েহি পেয়ার কা সামাঁ
মেরি আরযু পুকারে
মেরা দিলরুবা কাহাঁ।"

কেনেডি ভাই তাঁর দিলরুবা পেলেন কিনা জানি না। তবে আমি আমার 'দিলরুবা' পেয়ে যাই পরদিন ভোরেই। পাঠক, তাঁর সাথে শীঘ্রই পরিচয় করিয়ে দেব আপনাদের!

আমার দিলরুবার সাথে সাক্ষাৎ

সাড়ে ছ'টার দিকে দেখলাম দূরে একটি শহর। লাইটগুলো দেখে মনে হচ্ছিল এক বিশাল মশাল মিছিল যেন ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। জানতে পারলাম দার্জিলিং শহর আমাদের দৃষ্টির সীমানায় চলে এসেছে। দারুণ স্ফূর্তি লাগল। কোথায় ছিলাম আলীগড়ে, মাছি মশার হেডকোয়ার্টারে। আর কোথায় এসে পড়লাম দার্জিলিং। হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য!

দার্জিলিং ভারতের অন্যতম 'হিল রিসোর্ট'। পশ্চিম বাংলা রাজ্যের অধীনে এই পাহাড়ী শহরটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২১৩৪ মিটার অর্থাৎ প্রায় ৭০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। অনেকের মতে, 'দার্জিলিং' নামটি এসেছে 'দোর্জে' অর্থাৎ বজ্রপাত থেকে। ভিন্নমত পোষণকারীরা বলেন, দুর্জয়লিঙ্গ [অবজারভেটরী হিল] বা তিব্বতী ভাষায় বড় পাহাড়ই হল দার্জিলিং। আরও মত আছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, দার্জিলিং একটি রূপান্তরিত নাম। লেপচা ভাষায় ইশ্বরের বাসস্থান অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ দার্জ্যুল্যাঙ্গ থেকেই দার্জিলিং নামের উৎপত্তি। একটা ব্যাপার এখানে পরিষ্কার। প্রতিটি নামই দার্জিলিং-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে।

১৭৮০ সালের কথা। তখন দার্জিলিং সিকিম রাজ্যের অধীনে। এ সময় নেপাল থেকে গুর্খারা এসে দখল করে নেয় প্রকৃতির এই স্বর্গরাজ্যটি। অর্ধশতকের উপর গুর্খারাই শাসন করে। তখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে। দার্জিলিং-এর উপর নজর পড়ে গেল সুচতুর ব্রিটিশদের। ১৮৩৫ সালে গুর্খা হটাবার জন্য সিকিম রাজ্যের সাহায্যে এগিয়ে আসে তারা। চুক্তি হয়, বার্ষিক ৩০০০ টাকার বৃত্তিতে দার্জিলিংকে পারিতোষকে হিসেবে দখল নেবে ইংরেজরা। এভাবেই ভারতের অধীনে চলে আসে দার্জিলিং।

চায়ের জন্য বিখ্যাত দার্জিলিং। এর পেছনেও ব্রিটিশদেরই অবদান। ১৮৪০-এ তারা চীন থেকে চোরাপথে চায়ের বীজ আনে। দার্জিলিং পাহাড়ে শুরু হয়ে যায় চায়ের চাষ। তবে এতেই থেমে থাকে না ইংরেজরা। বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট সবকিছুর উন্নতি হতে থাকে

দ্রুতগতিতে। রাতারাতি যেন চেহারা বদলে যেতে থাকে "পাহাড়ী শহরের রাণী" দার্জিলিং-এর। পরিণত হয় পর্যটকদের তীর্থ কেন্দ্রে।

দার্জিলিং-এর মাটিতে পা রাখলাম সন্ধ্যা ৭টায়। পশ্চিম আকাশে সূর্য বিদায় নিয়েছে অনেক আগে। দার্জিলিং-এর জন্য বোধহয় ৭টাই রাত। রাস্তায় লোকজন কম। প্রচণ্ড শীতে কাঁপুনি এসে গেল সবার। হোটেলের সন্ধ্যানে হাঁটা শুরু করলাম। দু একটা হোটেলের ঠিকানা নিয়ে এসেছিলাম। শেষ পর্যন্ত 'হোটেল নির্ভানা'-তে উঠলাম। রেল স্টেশনের কাছেই নিচের দিকে একটি হোটেল। মাঝারি ধরনের বলা চলে। এখানে হোটেলগুলোর ভাড়া অন্যরকম। জনপ্রতি হোটেল ভাড়া নেয় এরা। সকাল-বিকাল নাস্তা ও দু'বেলা খাওয়া দেবে। আমাদের ঠিক হলো থাকা-খাওয়াসহ প্রতিজনে ১১০/= রুপী। যাই হোক দেরি করলাম না। পরদিন 'টাইগার হিল' যেতে হবে সূর্যোদয় দেখতে। দীপুর 'তাড়াতাড়ি' এর মধ্য দিয়ে চলতে থাকল আমাদের ওযু, নামায ও খাওয়া। এরপর লেপের তলায় গিয়েই আমার দুই সহচর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

কিন্তু নতুন জায়গায় এসে আমি চট্ করে ঘুমাতে পারি না। আমার দেহটি ক্লান্তিতে নিশ্চল হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু মনের কোন ক্লান্তি নেই। ছাব্বিশ মাইল দৌড়ানোর পর একজন ম্যারাথন দৌড়বিদের স্ট্যামিনাও ফুরিয়ে যায়। কিন্তু মনের স্ট্যামিনা অনিশেষ। তাই সে যথারীতি কাজ শুরু করে দিল। মনে করিয়ে দিল মনের ভেতর উথাল-পাথাল করা শত রকমের স্মৃতি। অনেকগুলো প্রিয়মুখ একে একে স্মৃতির মানসপটে উঁকি দিয়ে আবার উধাও হয়ে যেতে লাগল। মনে পড়ল আব্বার কথা। একাত্তর বছর পূর্ণ হলো তাঁর গত নভেম্বরে। কি চমৎকার একটি মানুষ। সংগ্রামী এ জীবনে তিনি কত ঝড়ের সম্মুখীনই না হয়েছেন। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কখনো সরে যেতে দেখেনি সেই স্বর্গীয় হাসি। সেই হাসির মধ্যে কত কথা, কত ভালবাসা ছড়িয়ে আছে তা বোঝানো যায় না, উপলব্ধি করা যায়।

"আঘাত যত নিজে বুকে নিয়ে সে
আমায় শুধু ভালবাসা দিয়েছে
তারই প্রেরণায় তারই মমতায়
জীবন সুন্দর হলো
পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা জগতের আলো

তাঁর সে চোখ দিয়ে দেখেছি মন্দ ভালো।”

আর আমার স্নেহময়ী মা? তাঁর কি কোন তুলনা আছে? একটিমাত্র শব্দ ‘মা’! কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কি অফুরন্ত নেয়ামত ছড়িয়ে আছে এর মধ্যে। দাঁড়িপাল্লার এক প্রান্তে মা এবং অপর প্রান্তে সমস্ত পৃথিবী রাখলেও মায়ের ভালবাসাই জয়ী হবে। আর আমার আম্মার মতো মা পৃথিবীতে একটিই আছে (সব সন্তানই তার মায়ের ব্যাপারে তাই মনে করে)। মেশিনের মতো নীরবে নিঃশব্দে চালিয়ে যাচ্ছেন আমাদের বিশাল সংসার। এতটুকু ক্লান্তি নেই, নেই কোন অভিযোগ। তাইতো এত বড় হবার পরও যখন আম্মার কাছে যাই তখন সেই ছোট্ট সালমান হয়ে যেতে ইচ্ছে করে যাকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়ানির গান গাইতেন তিনি পরম সোহাগ দিয়ে। এ ঋণ শোধ করা কি সম্ভব? কখনও না...

“মায়ের এক ধার দুধের দাম
কাটিয়ে গায়ের চাম
পাপস বানালেও ঋণের শোধ হবে না
এমন দরদী ভবে
কেউ হবে না আমার মা।”

আজ দেশ থেকে শত শত মাইল দূরে দার্জিলিং-এর এক হোটেলে শুয়ে আমার মন অনুশোচনায় ভরে যাচ্ছে। মনের অজান্তে কত কষ্টই না দিয়েছি আব্বা-আম্মাকে। আমার কাছ থেকে তাঁরা যা প্রত্যাশা করেন তার কতটুকু দিতে পেরেছি? হে মহান প্রভু! আব্বা-আম্মাকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত যেন আমার মৃত্যু না হয়!

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পাইনি। দীপুর ডাকে ঘুম ভাঙল। তিনটা পঁয়ত্রিশ বাজে। সাড়ে তিনটায় আমাদের ডেকে গেছে জীপের ড্রাইভার। ও একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। টাইগার হিলে যেতে হলে আগের দিন বলে রাখতে হয় জীপের জন্য। একটি জীপে ন-দশ জন করে লোক নেয়। টাইগার হিল যাওয়া, আসা ও পথে কয়েকটা জায়গা ঘুরানোর জন্য জনপ্রতি চল্লিশ রুপী করে দিতে হয়।

বাথরুম একটি। একে একে যেতে হবে। এক্ষেত্রে সবার শেষে যাওয়াই ভাল। আরও কিছুক্ষণ লেপের তলায় থাকা যাবে দীপুর তীর্যক দৃষ্টি সত্তেও। এ অভ্যাস আমার আজকের নয়। আমার পিঠাপিঠি বড় ভাই আর আমি একই রুমে থাকতাম। শীতকালে ফজরের নামাজের সময় বাথরুমে যাওয়া নিয়ে লাগতো ঝগড়া। আব্বা ডেকে যাওয়ার পর

আমরা একে অপরকে বলতাম আগে বাথরুমে যাওয়ার জন্য, যাতে আরও কিছুক্ষণ লেপের ভেতর শুয়ে থাকা যায়। অজুহাত হিসেবে আমার মাথা ব্যথা হতো, অথবা ভাইয়ার হতো পেট ব্যাথা। অলসতার এ প্রতিযোগিতায় যে পরাজিত হতো সেই বলতো, 'মাত্র পাঁচ মিনিট বেশি শুয়ে থাকলে কি লাভ হয় বুঝে আসে না।' আবার কখনও 'কেউ কারে নাহি ছাড়ে সমানে সমান' অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে মনের অজান্তে দুজনই ঘুমিয়ে পড়তাম। শেষে আম্মার ধমক খেয়ে 'ধড়মড়' করে উঠে কে আগে বাথরুমে যাবে সে নিয়ে আবার ঝগড়া লেগে যেত।

এখানে অবশ্য ভাইয়া নেই তবে তার চরিত্রের সাথে ৭০% মিল আছে এমন একজন আছেন। কেনেডি ভাই। ভাইয়ার সাথে আমার দেখা নেই চার বছর ধরে। ইংল্যান্ডে আছেন। তিন বছরের ফুটফুটে ছেলে ইউসুফকে নিয়ে খেলা করেন। আর আমি কেনেডি ভাইয়ের মাঝে খুঁজে পাই তাঁর প্রতিচ্ছবি। ভাইয়ার মতোই স্বাস্থ্য, অর্থাৎ হ্যাংলা-পাতলা, অসম্ভব আবেগী, সবকিছুতেই দারুণ উৎসাহ, গান গাওয়ার নামে পাগল, মাঝে মাঝে ভীষণ অভিমানী এবং সবার উপরে 'বিশাল' একটা হৃদয়। আর তাই কেনেডি ভাইকে এত ভাল লেগে গিয়েছিল।

দীপুর হৈ চৈ-এর ফলে বেশিক্ষণ শুয়ে থাকা গেল না। সোয়া চারটার মধ্যে রেডি হয়ে জীপে উঠলাম এবং অপেক্ষা করতে লাগলাম অন্যান্য যাত্রীদের জন্য। শীতের কাপড় লাগিয়েছি যথেষ্ট। গেঞ্জির ওপর সার্ট, তার ওপর সোয়েটার, তারও ওপর জ্যাকেট। এছাড়া গলায় মাফলার, মাথায় মোটা টুপি ও হাতে গ্লাভস। তারপরেও মনে হচ্ছিল বোধহয় বরফের বাথটবে শুয়ে আছি। কিন্তু দীপুর দিকে তাকিয়ে মনে হলো আমি বোধহয় গরমে ঘামছি। বেচারার অবস্থা শোচনীয়। একটু শীতেই কাবু হয়ে যায় সে। আর এসেছে অক্টোবরের শেষে ৭০০০ ফুট উঁচুতে দার্জিলিং এ। তার উপরে ভোর চারটা। গতবার আমরা ট্যুরে বেরিয়েছিলাম জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। উত্তর ভারতে তখন হাড় কাঁপানো শীত। প্রস্তুতি হিসেবে দীপু সেবার প্রতিদিন মধু খাওয়া শুরু করেছিল। এবার তেমন প্রস্তুতি নিতে পারেনি সে। ফলাফল পেতে তার বেশিদিন দেরি করতে হয়নি।

গরম চা খেয়ে শরীর কিছু গরম হলো। রওয়ানা হলাম টাইগার হিলের পথে। অ্যাডভেঞ্চার ও আশংকা দুটোই একসঙ্গে পেয়ে বসল আমাদের। সূর্যোদয় কেমন হবে এবং কাঞ্চনজঙ্ঘায় এর প্রতিফলন কেমন লাগবে ভাবতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। আবার আশংকা হলো,

যদি মেঘ থাকে? সূর্যোদয় বা কাঞ্চনজঙ্ঘা কোনটাই যদি দেখা না যায়? শুনেছি একবারে টাইগার হিলে সানরাইজ পাওয়া ১০% ট্যুরিস্টের ভাগ্যেও জোটে না। আমরা যদি ৯০% হতভাগাদের পাল্লায় পড়ি? তবে আশান্বিত হলাম এই শুনে যে, সূর্যোদয় দেখার জন্য এটাই সর্বোৎকৃষ্ট সময়। সেই ভরসাতেই আল্লাহকে ডাকতে থাকলাম।

টাইগার হিল দার্জিলিং-এর সবচাইতে উচু স্থান। উষ্চতা ২৫৯০ মিটার। দার্জিলিং থেকে এগার কিলোমিটার রাস্তা এঁকে বেঁকে উপরে ওঠে গেছে হিলটপে। রীতিমত ভয়ংকর রাস্তা! এত খাড়া উপরে ওঠে গেছে যে, জীপ ছাড়া আর কোন যানবাহন এভাবে উঠতে পারবে না। এ ভয়াবহ রাস্তাতেও অবশ্য কেনেডি ভাইয়ের গান বন্ধ ছিল না। গান গাইলে নাকি তাঁর শীত কম লাগে। হিল টপের কাছাকাছি এসে জীপ থেমে গেল। ট্রাফিক জ্যামের কারণে গাড়ি উপর পর্যন্ত যেতে পারবে না। হেঁটে উঠতে হবে। মাত্র দশ মিনিটের রাস্তা। এতেই হাঁপিয়ে উঠলাম। এমন কি রোলার স্কেটার কেনেডি ভাইয়ের ট্যামিনার বাতিরও নিভু নিভু অবস্থা। যাই হোক ৪:৫০ মিনিটের মধ্যেই টাইগার হিল পৌঁছে গেলাম।

চারিদিকে মানুষ আর মানুষ। হিলটপে একটি 'ভিউ পয়েন্ট' রয়েছে যেখানে টাকার বিনিময়ে উঠা যায়। তাকিয়ে দেখি সিড়িতে পর্যন্ত দাঁড়াবার জায়গা নেই। হাজার হাজার মাথা। এর শতকরা ৯০ ভাগ জিহবা থেকেই উষ্চারিত হচ্ছে বাংলা ভাষা। কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর সব যেন জড়ো হয়েছে ২৩শে অক্টোবর '৯৩-এর এই শীতের শিশির ভেজা ভোরে কাঞ্চনজঙ্ঘার সাক্ষাৎ লাভে। মনে হচ্ছে এক বিশাল তীর্থযাত্রা এসে শেষ হয়েছে এই টাইগার হিলে।

ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল অন্ধকার। চারিদিকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। নিচে কোথাও কোথাও মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। যেন সাদা সাদা কয়েকটি বিড়াল কুণ্ডলী পাকিয়ে সুখনিদ্রা যাপন করছে। আমাদের কৌতুহলী দৃষ্টি চলে গেল পূর্বের দিকে। দৃষ্টির শেষ সীমায় দেখতে পেলাম দিগন্ত। ভাবলাম ওদিক দিয়েই বোধ হয় সূর্য উঠবে। যতই সময় যাচ্ছে, চারিদিক আলোকিত হচ্ছে, ততই মনটা ছটফট করছে। সূর্য উঠছে না কেন? তবে কি সূর্যোদয় দেখতে পাব না? ধৈর্যচ্যুতি প্রায় ঘটে গেছে, ঠিক তক্ষণি কি মনে করে বাঁ দিকে তাকালাম।

আঁকাবাঁকা একটা রেখা নজরে পড়ল। জিনিসটা কি ঠাহর করতে না করতেই মনে হল একটা আবরণ খুলে গেল যেন। আরে! সাদা সাদা কি

দেখা যাচ্ছে না? বুঝতে পারলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। এই সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা। ৮,৫৮৬ মিটার অর্থাৎ ২৮,১৫৬ ফুট উঁচু। এভারেস্ট ও কেটুর পর পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। লোকমুখে কতই না শুনেছি এর নাম। কবির আবেগভরা কবিতায় দেখেছি কাঞ্চনজঙ্ঘাকে:

"অয়ি কাঞ্চনজঙ্ঘে
দেখেছি তোমার রূপ উত্তরবঙ্গে
মুগ্ধ নেত্রে দেখি মোরা তোমারে প্রভাতে
সাঁঝেতে আরেক রূপ, ভুল নেই তাতে-
তুষার ভাস্কর্য তুমি, মোদের গৌরব
সবে মিলে তোমারেই করি মোরা স্তব।"

সেই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আজ দেখছি নিজের চোখের সামনে! স্বপ্ন দেখছি না তো? না! চিমটি দিয়ে ব্যথা পেলাম যে? মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছি আর স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতায় গাইছি, 'এই দুটি চোখ দিয়েছ বলেই দেখি যে কতই অপরূপ।'

আমি কবি নই, সাহিত্যিক নই, গল্পকারও নই। আবেগ প্রকাশের জন্য না লিখতে পারি কবিতা, না ক্ষমতা আছে অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি করার, না সামর্থ্য আছে চমকপ্রদ গল্প লেখার। তবে কিভাবে আপনাকে বোঝাব কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার পর আমার মনের অনুভূতি? পৃথিবীতে আমার মায়ের চেয়ে সুন্দর সৃষ্টি আর নেই। কিন্তু কি করে অস্বীকার করব কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য? চেয়ে রইলাম অপলক চোখে। চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ছে না! হে প্রভু! তুমি কত মহান! আজ এই চোখ দুটি যদি তুমি না দিতে তবে কি দেখতে পেতাম তোমার এ অপূর্ব সৃষ্টি?

"তোমার দেয়া চোখের শোকর জানাব তার ভাষা কই
যতই দেখি ততই যেন পলকহারা চেয়ে রই।"

বুঝতে পারলাম। কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রেমে পড়ে গেছি। 'প্রথম দর্শনেই প্রেম!' এ প্রেম সুন্দরের প্রতি সৌন্দর্য পিপাসু এক যুবকের! এ প্রেম স্রষ্টার এক অপূর্ব সৃষ্টির প্রতি তাঁর বান্দার! এ প্রেম কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রতি আমার! এ প্রেম পবিত্র!

শ্বেতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা আমার মুগ্ধ দৃষ্টিতে লজ্জা পেয়ে গেল। প্রশংসা শুনলে সুন্দরী নারীদের রং যেমন লাল হয়ে ওঠে, তেমনি কাঞ্চনজঙ্ঘাও

লজ্জায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। মিটিমিটি চোখ দিয়ে যেন আমাকে দেখছে আর বলছে, 'এভাবে তাকিয়ে আছ কেন? আমার বুঝি লজ্জা করে না?'

পাঁচটা পঁচিশ। আবার রং বদলালো কাঞ্চনজঙ্ঘা। এবার মনে হলো অপূর্ব সুন্দরী কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন নববধূর সাজে সেজেছে। সোনালি রং জানিয়ে দিচ্ছে, নববধূকে মুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সোনার অলংকারে। মাথা নীচু করে শ্বশুর বাড়ির পথে রওয়ানা হচ্ছে সে।

হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল, 'ঐ তো সূর্য উঠছে।' এই যা! কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রেমে পড়ে তো ভুলেই গিয়েছিলাম এই সৌন্দর্যের রূপকার সূর্যের কথা। তাকালাম পূর্ব দিকে। কোথায় সূর্য? যে দিগন্ত দিয়ে সূর্য উঠবে আশা করেছিলাম, তাতো একই রয়েছে। দৃষ্টি নিচের দিকে গেল। দেখলাম গোলাপী রঙের একটি থালা যেন নিচু থেকে ওঠে আসছে। এতক্ষণে ব্যাপারটা উপলব্ধি করে নিজের বোকামিতে নিজেই হেসে উঠলাম। এত উঁচুতে দিগন্তে আসবে কোথা থেকে? ওগুলো ছিল মেঘ।

জীবনে প্রথমে সূর্যোদয় দেখলাম। প্রাণ ভরে উপভোগ করতে লাগলাম। এদিকে দোটানায় পড়ে গেছি। কোন দিকে তাকাব? সূর্যের দিকে না কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে? ওদিকে সূর্যের রঙ ধীরে ধীরে সোনালিতে পরিণত হচ্ছে। আর আমার 'দিলরুবা' কাঞ্চনজঙ্ঘা কাঁচা সোনা রূপে যেন তার মায়াভরা চোখ নিয়ে আমাকে কাছে ডাকছে।

পাগল বনে গেলাম একেবারে। একটার পর একটা ছবি তুলতে লাগলাম। কোথায় কেনেডি ভাইয়ের গান? কোথায় দিপুর তাড়াহুড়ো? সব নির্বাক! খালি ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দ। কিছুক্ষণ পর দেখি, তেত্রিশটা ছবি তুলে ফেলেছি। বাইনোকুলার নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে আমাদের তিনজনের মধ্যে। দীপুর বাইনোকুলার। কিন্তু তেমন চান্স পেল না সে। দু'জনকে একটু করে সুযোগ দিয়েই প্রাণভরে দেখতে লাগলাম আমি। খুব কাছ থেকে খুটিয়ে খুটিয়ে উপভোগ করলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য। যেন বাসর রাতে বর নববধূর সৌন্দর্যের দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রয়েছে।

দীপু ও কেনেডি ভাইও উপভোগ করছে সৌন্দর্য। প্রশংসার বৃষ্টি ঝরছে তাদের মুখ থেকে। কিন্তু আমি তখন এক ফ্যান্টাসির জগতে। সুপারম্যান হয়ে উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে আমার কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা যে আমাকে ডাকছে। কবিগুরুর গানে কণ্ঠ দিয়ে সে যে গানটি গাচ্ছে তা শুধু আমি-ই শুনতে পাচ্ছিঃ

"এসো এসো আমার ঘরে এসো আমার ঘরে

বাহির হয়ে এসো

বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে

এসো আমার ঘরে।"

বেরসিক দীপু সব ভেস্তে দিল। এমন রোমান্টিক মুহূর্তে ডিস্টার্ব করার কোন মানে হয়? ব্যাটিং ফর্ম কেবল পেয়েছিলাম! ছক্কা-চার পেটাতে শুরু করব, এমন সময় রান আউট করে দিল সে। বলল,

'চল, কফি খাব।'

'আহ! দিলিতো রোমান্টিক পরিবেশটার বারটা বাজিয়ে।'

'তোর আবার রোমান্স কিরে? সামান্য একটা বাঙালি মেয়ে জুটাতে পরলিনা এখনও, আর করবি কাঞ্চনজঙ্ঘার সাথে প্রেম?'

দেখলেন অবস্থা? পান্তা ভাতে যেন ঘি ঢেলে দিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার সাথে বাঙালি মেয়ের তুলনা? না, ডাক্তারি পড়তে পড়তে ওর হৃদয়টারও 'ওপেন হার্ট সার্জারী' হয়ে গেছে। মানুষের পেট কাটা ছাড়া আর কিছু বোঝে না সে। ওদিকে কেনেডি ভাই টিপ্পনী কাটলেন,

'প্রেমে পড়ছেন ভাল কথা! কিন্তু যদি ছ্যাক দিয়ে দেয়?'

মোহাব্বত অওর দোকানদারিমে বহুত ফারাক হ্যায়। আমার প্রেম একতরফা। আমার ভালবাসা ছ্যাক দিয়ে বিচার করা যাবে না।'

'দীপু ভাই, চলেন তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি। সালমান ভাইয়ের স্ক্রুগুলো ঢিলা হয়ে গেছে। কখন পড়ে যায় ঠিক নেই।' বলে কেমন করে চেয়ে রইলেন কেনেডি ভাই আমার দিকে।

এর পর আর কথা চলে না। এখন যদি দীপু সত্যি সত্যিই আমার মাথার স্ক্রু কতটুকু ঢিলা হয়েছে দেখার জন্য ছুরি হাতে অপারেশন শুরু করে দেয়? ওরে বাবা! অপারেশন আমার যম! ছোটবেলায় একবার অ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশন হয়েছিল লন্ডনে। তখন থেকে অপারেশন থিয়েটারের কথা মনে পড়লেই শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে আমার। আর তাই 'পাগল' বলে আমাকে নেতার আসন থেকে গদিচ্যুত করার কোন রকম সুযোগ না দিয়ে, তাড়াতাড়ি তিন কাপ কফি নিয়ে, কয়েক চুমুকে কফি শেষ করে, কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে 'আবার দেখা হবে' ভাব করে একটু তাকিয়েই এক প্রকার দৌড়ে চলে গেলাম জীপের দিকে।

জীপ নিচে নামছে। কেনেডি ভাই যথারীতি গান ধরলেনঃ

"তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার
কানে কানে শুধু একবার বলো
তুমি যে আমার।"

মড়ার উপর খাড়ার ঘা! কাঞ্চনজঙ্ঘা ফেলে এসে এমনি মনটা খারাপ। তার উপর কেনেডি ভাই ধরেছেন এমন একটি রোমান্টিক গান। কেনেডি ভাইকে অনুরোধ করতে যাব এ সময় গানটি না গাইতে, তখনই আমরা তিনজন একত্রে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। স্টার্টবিহীন অবস্থায় চমৎকার দক্ষতায় জীপ চালাচ্ছে ড্রাইভার। ওঠার সময়ে ফার্স্ট গিয়ারে চালাতে গিয়ে অনেক তেল ফুরিয়েছে। তাই গাড়ি যখন নিচের দিকে নামছে তখন ignition না দিয়েই চালিয়ে যাচ্ছে সুচতুর ড্রাইভার। খরচ বাঁচানোর জন্য কত উপায়ই না বের করে মানুষ।

নিচে নেমে প্রথম যে দর্শনীয় স্থানে জীপ থামল তা হচ্ছে 'ঘুম বুদ্ধ মনাস্ট্রি'। 'ঘুম' এলাকাটি দার্জিলিং শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে। এখানে হলুদ মাথার এ তিব্বতীয় বুদ্ধিস্ট মোনাস্ট্রিটি ১৮৫৫ সালে মাঙ্গোলিয়ান লামা সারা ইয়াংচো-র তৈরি। রাস্তা থেকে একটু নিচে নেমে যেতে হয় সেখানে। রাস্তার পাশে ফুটপাথে বাজার। গরম কাপড় থেকে শুরু করে দার্জিলিং-এর চা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে সেখানে। দীপু ও কেনেডি ভাই এটা ওটা নাড়াচাড়া করল। কিন্তু কিনল না কিছুই।

'ঘুম' থেকে শহরের পথে পড়ে 'বাতাসিয়া লুপ'। এ জায়গা থেকে পুরো দার্জিলিং শহর দেখা যায়। দুরবিণ নিয়ে দাড়িয়ে আছে অনেকে। আপনার কাছ থেকে তিন রুপী নিয়ে দেখিয়ে দেবে দার্জিলিং শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান। চোখ ঠেকিয়েছি বাইনোকুলারে আর একজন দেখিয়ে দিচ্ছে একে একে গভর্নর হাউস, লাল কুঠি, স্টেডিয়াম, দার্জিলিং এর বৃহত্তম চা বাগান, আর্মি ব্যারাক ইত্যাদি। এ ছাড়া হিন্দি ফিল্ম শুটিং কোথায় কোথায় হয় তাও খুব আগ্রহ ভরে দেখালো লোকটি। আর বলাই বাহুল্য আমার 'প্রিয়তমা' কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখা যাচ্ছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘায় তিনটা ক্ষুদ্রাকৃতি চূড়া আছে। এর একটি ভারত, একটি নেপাল ও একটি চীন সীমান্তের অন্তর্ভুক্ত। কাঞ্চনজঙ্ঘার বাঁ পাশে দুটি চুড়া নিয়ে কুম্ভকুমারী পর্বতশৃঙ্খ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটি চীন ও নেপাল সীমান্তের অংশ। সর্ববামে রয়েছে একটি শৃঙ্গ যা নেপালের অংশ (এর নাম জানা যায়নি) আর সর্বডানে সিকিম রাজ্যের অধীনে রয়েছে কাবর, পান্ডিম,

মাকালু, লাটসেসহ নানান তিব্বতীয় শিখর। এ পর্বতগুলো এক অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করেছে।

সুযোগ পেয়ে আবারও কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য সুধা পান করছি দু'চোখ ভরে। সূর্য এখন বেশ উপরে। তাই কাঞ্চনজঙ্ঘা নিজেকে আবৃত করেছে উজ্জ্বল বর্ণের পোশাকে। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখতে পারলাম না। দীপু এক প্রকার টেনে-হিচড়ে আমাকে নিয়ে গেল জীপের দিকে। ৮টার দিকে আমাদের নামিয়ে দেয়া হলো হোটেলের সামনে। নাস্তা খাবার পর আবার বের হবো দার্জিলিং শহরের ৭টি দর্শনীয় স্থান দেখতে, যেগুলোকে এরা বলে seven stars।

এক অদ্ভুত স্বপ্ন

ঠিক দশটায় রওয়ানা হলাম। প্রথমেই হিমালয় মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। ভারতের প্রথম পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এটি। ১৯৫৪ সালে এর যাত্রা শুরু। এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নরগে প্রথমে এই ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষক ছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব

পালন করেন। তাঁর সমাধি এ ইনস্টিটিউটের পাশেই। মে মাসটি তেনজিং-এর জন্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ৯ মে ১৯১৪ জন্ম, ২৯ মে '৫৩ স্যার এডমন্ড হিলারীর সহকারী হিসেবে এভারেস্ট জয় এবং ১৪ মে ১৯৮৬ পরলোকগমন।

ইনস্টিটিউটের সবচাইতে আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে দুটি যাদুঘর। প্রথমেই ঢুকলাম 'মাউন্টেনিয়ারিং মিউজিয়ামে'। অনেক কিছু জানতে পারলাম এখানে। ১৮৫৭ থেকে হিমালয়ের নানান শিখর অভিযান পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হয়েছে। রয়েছে পাহাড় চূড়ার প্রণালী ও সাজ-সরঞ্জাম। মিউজিয়ামটি ঘুরে ঘুরে জানলাম হিমালয় পর্বতমালার সর্বমোট ৯৩ টি চূড়া রয়েছে। এর মধ্যে ৮ হাজার মিটারের উপরে রয়েছে ১৪টি চূড়া। সর্বোচ্চ মাউন্ট এভারেস্ট ৮.৮৪৮ মিটার অর্থাৎ ২৯.০২৮ ফুট। কাশ্মীরে অবস্থিত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ 'কে টু'। এর উচ্চতা ৮,৬১১ মিটার। তৃতীয় সর্বোচ্চ চূড়ার কথা আগেই বলেছি। ৮,৫৮৬ মিটার উচু কাঞ্চনজঙ্ঘা।

এরপরই ঢুকলাম এভারেস্ট মিউজিয়ামে। ২ নভেম্বর '৬৭ তে এই যাদুঘরটি চালু হয়। দু'টি তালিকা দেখতে পেলাম। একটি ভারতীয় এভারেস্ট বিজয়ীদের তালিকা। অপর তালিকাটি মহিলা বিজয়ীদের। ১৬ মে '৯৩ পর্যন্ত ৩১ জন ভারতীয় ও ২৩ জন মহিলা পর্বতারোহী এ দুঃসাধ্য সাধন করেন। এভারেস্ট প্রথম যে মহিলার নিকট পরাজিত হয় তিনি হচ্ছেন জুনকো তাবেঈ নামক একজন জাপানী মহিলা। ১৯৭৫ সালের ১৬ মে ছিল সেই ঘটনাবহুল দিন। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। ভারতীয় ৩১ জনের সকলেই এবং মহিলা ২৩ জনের মধ্যে ২১ জনই মে মাসে এভারেস্টের চূড়ায় বিজয়ের হাসি হাসেন। সম্ভবত এ মাসটি এভারেস্ট অভিযানের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সময়।

আরও অনেক কিছু দেখলাম। প্রচুর ছবি ছাড়াও রয়েছে হিলারী ও তেনজিং-এর পর্বতারোহণের সরঞ্জামাদি। দীপুর সবকিছুতেই আগ্রহ। 'এটার নাম লিখে রাখ ওটার নাম লিখে রাখ' ইত্যাদি। অবস্থা দেখে মনে হয় সবসময় তার হাতে একটা অভিজ্ঞতা সংগ্রহের ঝোলা আছে। হাতের সামনে যা পাবে তাই ও ঝোলায় ঢোকাবে। কিন্তু ঝোলাটি খুলবে না কখনও। ভাল করেই জানি, ঢাকায় গেলে কোথায় যাবে এসব অভিজ্ঞতা। মগবাজার-মিটফোর্ড-মগবাজার করতে করতেই প্রাণ যাবে।

মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে 'পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জ্যুওলজিক্যাল গার্ডেন।' এ চিড়িয়াখানায় কিছু

অসাধারণ প্রজাতির প্রাণী আছে। হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, বার্কিং ডিয়ার, সাইবেরিয়ান টাইগার, তিবেতান উল্ফ, স্নো লেপার্ড, রেড পাণ্ডা ইত্যাদি।

শহর থেকে ৩ কি. মি. দূরে 'রোপওয়ে' ছিল আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল। রঙ্গীত উপত্যকায় এ রোপওয়েটিই হচ্ছে ভারতে সর্বপ্রথম। ৫ কি.মি. দীর্ঘ এ রোপওয়েটি সিঙ্গলা বাজারের সাথে দার্জিলিং শহরের সংযোগ ঘটিয়েছে। ছয়জন করে যাত্রী এক ঘন্টার অ্যাডভেঞ্চার করে অর্জন করে এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমাদের ভাগ্যটাই খারাপ। পূজার ছুটিতে প্রচণ্ড ভীড়। সেদিনের কোন টিকেট নেই। এরপর তিন দিন পূজা উপলক্ষে বন্ধ। সুতরাং, আমাদের কপালে রোপওয়ে চড়া নেই। সবাই হতাশ। বিশেষকরে দীপু ও কেনেডি ভাই। আমি কাশ্মীর ও দক্ষিণ ভারতে রোপওয়ে চড়েছি। কিন্তু তাদের প্রথম সুযোগটাও হাতছাড়া হয়ে গেল।

এরপর একে একে ঘুরলাম লয়েড বোটানিকাল গার্ডেন, ন্যাচারাল হিস্টরী মিউজিয়াম, আভা আর্ট গ্যালারী, তেনজিং ও গম্বো রক [যেখানে পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ দেখা যায়]। এরপর গেলাম তিব্বতীয় রেফুজী সেফল হেল্প সেন্টার।

চীন তিব্বত দখল করার পর তিব্বতীয়দের ধর্মীয় নেতা দালাইলামা পালিয়ে যান। এরপরই ১৯৫৯ সালের ১ অক্টোবর মাত্র ৪ জন কর্মী ও দুটি কক্ষ নিয়ে যাত্রা শুরু হয় এই রেফুজী সেন্টারের। সে সময় হাজার হাজার শরণার্থী তিব্বত ছেড়ে দার্জিলিং চলে আসে। এদের পুনর্বাসনের জন্য দশ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। চাঁদা, অনুদান, চ্যারিটি শো, প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ ছাড়াও বিভিন্ন দাতব্য সংগঠনও অংশ নেয় এদের পুনর্বাসনে। স্থানও মিলে যায় তাদের। চার একরের যে ছোট্ট জায়গাটি প্রাথমিকভাবে তারা পায়, ঠিক সেখানেই ত্রয়োদশ দালাইলামা ১৯১০ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত নির্বাসিত জীবন কাটান।

চৌত্রিশ বছর পর আমরা যে রেফুজী সেন্টার দেখলাম তা বেশ উন্নতি সাধন করেছে। আজ শিশু শ্রমিকসহ ৬৫০ জন কর্মী প্রতিদিন কাজ করে একে একটা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই সেন্টার থেকে বের হয়ে প্রায় দেড় হাজার শরণার্থী নিজেদের ব্যবসা পর্যন্ত দাঁড় করিয়েছে।

ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন কাজ চলছে। কার্পেট উইভিং, উল কন্ডিং ও স্কিনিং, টেইলারিং ও লেদার ওয়ার্ক, নিটিং ও পেন্টিং উল মেকিং, উড কার্ভিং, কার্পেনটারী ইত্যাদি। প্রথম কক্ষে ঢুকেই পোস্টার দেখলাম 'Stop the Chinese from using Tibet as a nuclear dump & base'। দেখতে পেলাম বেশ কয়েকজন বুড়ো কাজ করছে। সবচাইতে বয়স্কজনের সাথে কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম হিন্দি বা ইংরেজি কিছুই বুঝে না। আকার-ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে জানলাম তার নাম সিরিং ভচে। বয়স ৯২। আরেক রুমে দেখলাম কিশোর থেকে শুরু করে বুড়ো বুড়ি পর্যন্ত নিবিষ্ট মনে উল কার্ডিং ও স্কিনিং এর কাজ করছে। চারিদিকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করে খেলছে। খুব ভাল লাগল। তবে সবচেয়ে বেশি চমৎকৃত হলাম শিশুদের কক্ষে গিয়ে। বেশ বড় একটি রুমে ৩০/৪০ টি ছোট ছোট বিছানা দেখা গেল। মিষ্টি বাচ্চাগুলোর কেউ ঘুমুচ্ছে, কেউ খেলা করছে, কেউ নতুন হাঁটা শিখছে। ওদের জন্য চকোলেট নিয়ে দিলাম কেয়ারটেকারদের হাতে। বাচ্চাগুলো চকোলেট খাচ্ছে আর আমি ভাবছি, ওরা কি জানে কি নিয়তি অপেক্ষা করছে ওদের জন্য?

আমি ঘুরে ঘরে এই সেন্টার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি। আর দীপু ও কেনেডি ভাই এখানকার শোরুমে যে ঢুকেছে আর বের হবার নাম নেই। শপিং-এ দীপু ওস্তাদ। গতবারের ট্যুরেও ১০০/= ডলারের মতো শপিং করেছে। এবারও বোধহয় এরকমই বাজেট তার। যা ভেবেছিলাম তাই। প্রায় ৪০০/= রুপী খরচ করে ফেলল। অবশ্য এর মধ্যে চমৎকার একটি তিব্বতীয় ওয়েস্টকোটও আছে। শো রুমটা বেশ সমৃদ্ধ। এদের হাতে বানানো জিনিসগুলো চোখ ধাঁধানোর মতো। চোখ বুলালাম চারিদিকে। দালাইলামার বিশাল একটি ছবি ও তার নিচে ১৯৮৯ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভের জন্য অভিনন্দন পত্র। বেইজিং ২০০০ সালের অলিম্পিক গেমস্ আয়োজনের চেষ্টা করছে। এর প্রতিবাদে দেখলাম একটি স্টিকারেঃ

"The 2000 Summer Olympics
Beijing Doesn't Deserve
the Honour to Host it"

চলে আসার আগে শো রুমের ম্যানেজার ভদ্রলোকটি একটি লিফলেট দিলেন। তিব্বতের স্বাধীনতা দাবী সম্বলিত লিফলেট। অনেক কথাই লেখা রয়েছে। খটকা লাগল লিফলেটের শেষের শ্লোগানটি পড়ে। লেখা

রয়েছে, 'Jai Bharat! Jai Tibbet!' দ্বিতীয় শ্লোগানটি অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথমটি?

সবশেষে গেলাম এবং রেসকোর্সে। আকারে ছোট হলেও এটিই বিশ্বের সবচাইতে উঁচু রেসকোর্স [১,৮০৯ মিটার]। রেসকোর্স এসে দীপুর মনে পড়ল সে রেফুজী সেন্টারের শো রুমে তার সানগ্লাস ফেলে এসেছে। আজ সকাল থেকেই দীপু সবকিছুতেই লেট। দেরীতে sight seeing-এ বের হলো, রেফুজী সেন্টারে সবাইকে দেরি করিয়ে কেনাকাটা করল। এরপর এখন আবার সবাইকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে সে আর কেনেডি ভাই দৌড়ে গিয় সানগ্লাস নিয়ে আসল। এছাড়া সকালে হোটেলে বেচারার চশমাটাও ভেঙে যায়। Really, it was not his day!

দুপুরে হোটেলে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি। কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন থেকে শুরু করে তিব্বতী রেফুজী ক্যাম্প পর্যন্ত মনটা ছিল অত্যন্ত ব্যস্ত। এখন মনের মধ্যে একটা vacancy দেখা দিয়েছে। সাধারণত Empty mind is devil's workshop' কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রভাবে হোক আর দার্জিলিং এর শীতের কারণেই হোক শয়তানের সাক্ষাৎ ঘটল না। এর পরিবর্তে কয়েকটা চমৎকার নাম স্মরণ করিয়ে দিল আমি আলীগড়ে কি মহা আনন্দে আছি। আমার সবগুলো বন্ধু এবছর আলীগড় ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু কয়েকজন ছোট ভাই সে অভাব এমনভাবে পূরণ করেছে যে মনেই হয় না বিদেশে আছি। তৈমুর, টিপু, ইমরান, শিবলী, আপেল, মাহমুদ, খাজা, তুষার, রোমেল এরা সকলে আমাকে এমন শ্রদ্ধা করে যে মাঝে মাঝে লজ্জাই করে। কার কথা বলব? এই ধরুন খাজা মাসুদ। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। আমার জীবনে এত বড় হৃদয়ের ছেলে আমি কমই দেখেছি। সব ছেলের মধ্যে থেকে ওকে সহজেই আলাদা করা যায়। প্রথমত, ওর ব্যবহার, দ্বিতীয়ত, ওর বিশাল আকৃতির ভুড়ি। এ ভুড়িটি খাজার খুব প্রিয়। অতি যত্ন করে লালন করে সে। ওর মতে এ বয়সে নাকি ভুড়ি থাকা প্রয়োজন।

খাজার রুম পার্টনার তুষার। অত্যন্ত interesting একটি character। সাংঘাতিক সরল সোজা। আর সে সুযোগে সবাই তাকে নিয়ে মজা করে। বিশেষ করে ও গান গাইতে ধরলেই একযোগে হাসির রোল ওঠে সকলের। এতটুকু মাইন্ড করে না অবশ্য তুষার এতে। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে আরেকটা গান ধরে। কেমন গান গায় সে? আমি বড় ভাই! আর তাই আমার কিছু বলার নাই!

এবার ছন্দপতন ঘটালেন কেনেডি ভাই। আমার আনমনা ভাব দেখে বোধ হয় আমার স্ক্রু নিয়ে পুনরায় গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন। তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে বললাম আমার চিন্তার বিষয় কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়। তেমন বিশ্বাস করলেন বলে মনে হলো না। তবে কিছু বললেনও না। কি মুশকিল! এরা কি ভেবেছে আমি সত্যিসত্যি পাগল হয়ে গেছি? মানুষ কি প্রকৃতিকে ভালবাসতে পারে না? এমন বেরসিক পার্টনার নিয়ে কেন যে এলাম এ অপূর্ব শোভা দেখতে? কবি-সাহিত্যিক পার্টনার পেতাম, দারুণ হতো। হয়তো সৃষ্টি হয়ে যেত আমি ও কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নিয়ে এক চমকপ্রদ প্রেমকাহিনী।

সন্ধ্যায় ম্যালের দিকে রওয়ানা হলাম। 'ম্যাল' হচ্ছে দার্জিলিং এর প্রাণকেন্দ্র। কি নেই এখানে? দোকানপাট থেকে শুরু করে হোটেল-রেস্তোরা-পার্ক কিছুই বাদ নেই। হাজারো মানুষের ভীড়ে ম্যাল চৌরাস্তাটি একটি উৎসব নগরীতে পরিণত হলো যেন। একেবারে উপরে একটি শিবমন্দির আছে। পূজা উপলক্ষে সেখানে চলছে গান-বাজনা। আশেপাশে ঘোড়া নিয়ে ঘুরছে কয়েকজন খদ্দেরের আশায়। আমরা যাচ্ছি মনের আনন্দে। সেদিন দূর্গাপূজার নবমী। হোটেলে ফিরছি, এমন সময় এক মন্দির থেকে ভেসে এলো ভজনের আওয়াজঃ

"দোদিন কা জাগমে লিলা সাব

চালা চালে কা খেলা।"

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তাই জানিয়ে দিচ্ছে এই ভজন। আমাদের গানও তো একই বাণী বহন করে যখন আমরা গেয়ে উঠিঃ

"পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়,

মরণ একদিন মুছে দেবে সকল রঙীন পরিচয়।"

তবে কিসের পার্থক্য আমাদের? সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখে মুসলিম-বৌদ্ধ-হিন্দু-খ্রিস্টান সকলেই। সকলেই মানে এ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে একদিন আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে মৃত্যু যবনিকার ওপারে। সেখানে ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি পাওয়া যাবে। সব ধর্মই বলে মানবতার কথা! সত্যের কথা! ভালবাসার কথা! শান্তির কথা! তবে কেন আজ এ ধর্ম নিয়েই এত রক্তের খেলা? গত ডিসেম্বর ভারতে কয়েক হাজার নিরীহ লোক প্রাণ দিল কি কারণে? এর প্রতিক্রিয়া কেন দেখা দিল আমাদের দেশে ও পাকিস্তানে? আর আমাদের দেশের সামান্য কিছু সাম্প্রদায়িক ঘটনাকে পুঁজি করে কেন একশ্রেণীর

স্বার্থান্বেষী মহল তৎপর হয়ে উঠেছে? এসব প্রশ্নের কি কোন উত্তর আছে?

মন্দির চত্বরে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে ভজন শুনছি আর এসব চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মস্তিষ্কে। মন্দিরের দেয়াল ধরে দাঁড়াতেই চারিদিকে নজর পড়ল শুধু বাতি আর বাতি। দার্জিলিং যেন একটি প্রদীপনগরী। পরদিন চলে যেতে হবে ভাবতেই বেশ খারাপ লাগছিল। মাত্র দু'দিনেই দার্জিলিং আমাদের কত আপন করে নিয়েছে। এর মায়া ছেড়ে কাল চলে যেতে হবে হিমালয়ের দেশ নেপালের পথে। আর সে চিন্তাই আমাদের বাধ্য করল তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে যেতে।

নামায ও খাওয়ার পর আমাদের আসর চলল। এ কয়দিন যন্ত্রের মতো ব্যস্ত থাকায় ভাল করে আড্ডা দেয়ার সময়ই পাওয়া যায়নি। আজ সুযোগ পাওয়াতে যেন তিনজনেরই জমে থাকা কথাগুলো ছিটকে পড়তে শুরু করল। রাত যতই গভীর হচ্ছে, ততই আমরা বিনিময় করছি না বলা অনেক কথা, অনেক আবেগ। এ ব্যাপারটি একটি প্রমাণিত সত্য। গভীর রাতে মানুষ মনের অজান্তে অনেক গোপন কথা বলে ফেলে। আমাদের কথোপকথনও এভাবেই এগুচ্ছে। কিন্তু সেসব কথা আপনাদের জানাতে পারছি না বলে দুঃখিত। আমার নিজের কথা জানানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। আর দীপু ও কেনেডী ভাইয়ের সেসব কথার একাংশও যদি ফাঁস করে দেই তবে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

রাতে দেরি করে ঘুমিয়েছি। ফজরের নামাজের পর তাই দ্বিতীয় ইনিংস ঘুমুতে হল। হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম পাশে দীপু ও কেনেডি ভাই নেই। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি শ্বেত-শুভ্র পোশাকে কে যেন দাঁড়িয়ে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। সে ভয় ক্রমে দূর হতে লাগল যখন আরও কাছে এলো সেই পোশাকধারী। আশ্চর্য! আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক অপূর্ব সুন্দরী রমণী। সমস্ত শরীর তার ধবধবে সাদা কাপড়ে আবৃত। শুধু মুখটিই দেখা যাচ্ছে। এমন সুন্দর ও পবিত্র মুখ আমি কখনও দেখিনি। কিন্তু এ মেয়েটি এখানে এসময় কেমন করে এলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। প্রশ্ন করলাম, 'কি চাও?'

মেয়েটি বলল,

'তোমাকে!

'আমাকে!

'হ্যাঁ'।

‘কেন? তুমি আমার কে?

‘আমি তোমার প্রিয়তমা।’

‘প্রিয়তমা! আমার কোন প্রিয়তমা নেই।’

‘কালই আমায় প্রিয়তমা বলে ডাকলে। আর আজ ভুলে গেলে?

‘কে তুমি?’

‘কাঞ্চনজঙ্ঘা।’

বলেই মেয়েটি মিষ্টি হাসি দিয়ে পিছু হটতে শুরু করল। আমার সমস্ত অস্তিত্ব তখন ভীষণ নাড়া অনুভব করল। মোহগ্রস্তের মতো পিছু নিলাম মেয়েটির। আমার কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আমায় পেতেই হবে। মেয়েটি দৌড়াচ্ছে। আমিও দৌড়াচ্ছি। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না। একটা মেয়ের সাথে দৌড়ে পারছি না ভেবে ভীষণ জেদ পেল। বেড়ে গেল দৌড়ের গতি। হঠাৎ যেভাবে উদিত হয়েছিল সেভাবেই যেন উধাও হয়ে গেল মেয়েটি। আর আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম এক অদ্ভূত জায়গায়।

চারিদিকে যেখানে চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। কিন্তু আশ্চর্য! এর মাঝেও কেমন করে আমি পায়জামা ও গেঞ্জি পরে রয়েছি বুঝলাম না। আরে! ওটা কি দাঁড়িয়ে আছে সামনে? একেই না দেখেছি কাল সকালে? এর প্রেমেই না পড়েছি আমি? কাঞ্চনজঙ্ঘা! হ্যাঁ! আমার প্রিয়তমা কাঞ্চনজঙ্ঘাই নারীর রূপ নিয়ে আজ আমায় নিয়ে এসেছে তার কাছে। স্বমূর্তি ধারণ করে সে আমাকে যেন পর্যবেক্ষণ করছে। এবার কি ঘটছে? কাঞ্চনজঙ্ঘা আমায় নিয়ে এলো কেন? কি করবে সে আমাকে নিয়ে?

‘এই সালমান, ওঠ!’ দীপুর ডাকে ঘুম ভাঙল। ওরা দু’জনই চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। ওদিকে জানালা গড়িয়ে সকালের মিষ্টি রোদ পড়েছে আমাদের রুমটিতে। কি মনে করে জানালা খুললাম। থ বনে গেলাম একেবারে। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে আমাদের রুম থেকেই। গতকার মেঘের কারণে দেখা যায়নি। আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দীপু ও কেনেডি ভাইও তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল। ওদের বলতে গিয়েও বললাম না একটু আগে দেখা আমার স্বপ্নের কথা। বললেই আবার ঠাট্টা শুরু করে দেবে। আমার নিজের কাছেও অবাক লাগছে। ব্যাপারটা বাড়াবাড়িই মনে হলো। একটা পর্বতের চূড়া এমনভাবে আকর্ষণ করল আমাকে যে শেষ পর্যন্ত স্বপ্নই দেখে ফেললাম! মানুষের মনে কোন জিনিস

স্থায়ী আসন গাড়লে বোধহয় এমনই হয়। বুঝতে পারলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য সত্যিসত্যিই দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে আমাকে।

শিলিগুড়ির পথে বাস যখন রওয়ানা দিল তখন বাজে সকাল দশটা। আজই আমরা নেপালের পথে যাত্রা শুরু করব। বর্ডারে কোন ঝামেলা হবে কিনা, কাঠমুণ্ডুর বাস ঠিকমত পাব কিনা ইত্যাদি নানান দুশ্চিন্তা বেশ পেয়ে বসেছিল আমাদের। জানালা দিয়ে তাকাতেই সব চিন্তা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। কাঞ্চনজঙ্ঘা আমাদের বিদায় জানাচ্ছে। চূড়ার নিচে কিছু মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে যেন তার রূপ বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ। খুব খারাপ লাগছিল চলে যেতে। শেষবারের মতো ভাবুক বনে যেতে বাধ্য হলাম। গানে গানে বিদায় জানালাম কাঞ্চনজঙ্ঘাকে:

"আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায়

মোছ আঁখি দুয়ার খোল দাও বিদায়।"

কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন শুনতে পেল আমার গান। প্রত্যুত্তরে সেও গান গেয়ে ওঠল। ষষ্ঠ ইন্দ্রীয় দিয়ে যেন সে গান শুনতে পেলাম আমি:

"চালতে চালতে মেরা ইয়ে গীত ইয়াদ রাখনা

কাভি আল বিদা না ক্যাহনা

কাভি আল বিদা না ক্যাহনা।"

দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল কাঞ্চনজঙ্ঘা। কাঞ্চনজঙ্ঘা, ক্ষমা করে দাও আমাকে! তোমাকে আর কখনও 'আল বিদা' বলব না। তুমি তো আমার সাথেই রয়েছো। আজীবন তুমি আমার হৃদয়ে থাকবে আমারই প্রিয়তমা হয়ে। প্রতিজ্ঞা করছি, আল্লাহ কবুল করলে অন্তত আর একটি বারের জন্য হলেও আসব তোমার কাছে। আমার জীবনে যদি কোন নারী জীবনসঙ্গিনী রূপে আসে, তাকে সাথে নিয়েই আসব। পরিচয় করিয়ে দেব তোমার সাথে। কারণ তুমি কাঞ্চনজঙ্ঘাই আমার জীবনের প্রথম প্রেম।

যন্ত্রনাময় এক ভ্রমণ

শিলিগুড়ি পৌঁছে প্রথমেই খেয়ে নিলাম। নামাযের সময় হয়ে গেছে। নামায কোথায় পড়ব? অনেক খুঁজে পথে একটি মসজিদ পেলাম। সেখানে জোহর-আসর একসাথে পড়ে রওয়ানা দিলাম বর্ডারের দিকে। শিলিগুড়ি থেকে বর্ডার পর্যন্ত এক ঘন্টা বাসে দাঁড়িয়ে, ভারতের কাস্টম্স ও ইমিগ্রেশন-এর কাজ সেরে, নেপালের কাস্টম্স পার হয়ে, ইমিগ্রেশনে পৌছে দেখি চারটার ওপরে বাজে। নেপাল ইমিগ্রেশন একেবারেই ফাঁকা। ভারতীয়দের জন্য ভিসা লাগে না। কিন্তু বাংলাদেশীদের লাগবে। শুধু তাই নয়, কলকাতায় আমাকে ১৩০০/= রুপী ভিসা ফি দিতে হলো। এই ফি-এর ভয়ে বেশিরভাগ বাংলাদেশীই ভারতীয় সেজে বর্ডার পার হয়। কিন্তু আমি তা ঠিক মনে করিনি। তাছাড়া পাসপোর্টে একটা দেশের ভিসা লাগলে মন্দ কি? ইমিগ্রেশনের ভদ্রলোক জানালেন আমি ভিসা না করে এসে তাকে ৫০০/= রুপী দিলেই এখান থেকে ভিসা পেয়ে যেতাম। ৮০০/= রুপী অতিরিক্ত দিয়েছি এই ভেবে নাকি ব্যাটা ঘুষের কথা বলছে এই কারনে, মেজাজটা সাংঘাতিক রকম খারাপ হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে কাজ শেষ করে বেরিয়ে দেখি দীপুর মুখ থেকে অবিরাম বর্ষিত হচ্ছে আমাকে উদ্দেশ্য করে বকাবকি। ওরা আগে আগে এসে টিকেট করেছে বাসের। বাস প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। এমতাবস্থায় আমি দেরি করছি দেখেই তার রাগ। এটিই কাঠমুণ্ডুগামী শেষ বাস। যাই হোক, দীপুর বকা হজম করে ওঠে পড়লাম বাসে।

আমার এ জীবনে আমি ভ্রমণ কম করিনি। এর সিংহভাগই হয়েছে বাসে করে। তবে এবারের মতো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি কখনও। বাস ভালই। টু বাই টু চেয়ার কোচ। কিন্তু তাতে কি? আমাদের জন্যে সিট জোটেনি। ১৬০/= ভারতীয় মুদ্রার এক পয়সাও কম দেইনি। তারপরও মোড়া ছাড়া বসার জন্য কিছুই জুটল না; সেই মোড়ার জন্যও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হলো দু-ঘন্টা। এই প্রথম মোড়াতে করে দূরপাল্লায় যাত্রা করছি। দু'পাশে সীট। মাঝখানে মোড়ায় বসে আছি আমরা। সে সময়কার মনের অনুভূতি কিভাবে ব্যক্ত করবো? আশেপাশের লোকদের তাচ্ছিল্যভরা চাহনি যেন কাটা ঘায়ে নূন ছিটালো। ভাবটা এমন যেন তাদের করুণায় আমরা বসতে পেরেছি। আমাদের বাঁ পার্শ্বের বিশাল গ্রপটি কলকাতার। আর

ডানপাশের গ্রুপটি এসেছে আসাম থেকে। বাঁ কানে শুনছি বাংলা আর ডান কানে আসামী। এ দুয়ে মিলে যে 'জগাখিচুড়ীর' সৃষ্টি হলো তা আমার ভাষাবিজ্ঞানের সীমার বাইরে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কোন ভাষা শুনলেই আমার মস্তিষ্ক তৎপর হয়ে ওঠে। ভাষাটির উৎস, বৈশিষ্ট্য, আমাদের ভাষার সাথে ধ্বনিগত পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দেই। আসামী ভাষার সাথে বাংলা ভাষার বেশ মিল। তাই স্বভাবতই এ ভাষাভাষীদের পেয়ে আগ্রহ বেড়ে যাওয়ারই কথা। কিন্তু যে অবস্থায় আমরা পড়েছি, সে অবস্থায় আমি কেন, স্বয়ং আমাদের আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পিতা [Father of modern Linguistics] ফার্ডিনান্ড ডি সসুর পর্যন্ত কানে ওয়াকম্যানের হেডফোন লাগিয়ে জোরে হেভি মেটাল শুনে নিজেকে রক্ষা করতে তৎপর হতেন। তারপরও বাঙালি ও আসামীদের চিৎকার থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারতেন কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

'ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডন' কথাটি ভেবে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসছিলাম। কিন্তু যখন জানতে পারলাম, কাঠমুণ্ডু পৌঁছতে পরদিন সকাল ১০টা বেজে যাবে, তখন আমাদের হার্টফেল করা বাকি। তার মানে আমরা এই অবস্থায় মোড়ায় বসে ১৮ ঘন্টা জার্নি করবো? ভাবতেই গায়ে জ্বর আসার উপক্রম। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'সংসারের সুখ-দুঃখ অনুভব করা যেন উটের কাঁটাগাছ খাওয়ার মতো। ক্ষুধা নিবৃত্তির আনন্দ সে তাতে পায় বটে কিন্তু ওদিকে খোঁচায় ঠোট দিয়ে দরদর করে রক্তও পড়ে।' আমাদের অবস্থাও তদ্রুপ। ভ্রমণে একটা রোমাঞ্চ আছে বটে। কিন্তু কাল সকালে কাঠমুণ্ডু পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের চাদবদনগুলোর অবস্থা যে কাঁটাগাছ খাওয়া উটের চেয়ে কোন অংশে ভাল হবে না তা বলাই বাহুল্য।

সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না। একটু পরে যে অভিজ্ঞতা হলো তা বর্ণনাতীত। রাস্তা যে এত খারাপ হতে পারে তা যদি কল্পনাও করতাম তবে নেপাল ভ্রমণের চিন্তা করার আগে দশবার ভাবতাম। নাগরদোলা যাকে বলে। এক একটা ঝাঁকুনি মোড়া থেকে আমাদের মাথা প্রায় বাসের ছাদে ঠেকিয়ে দিচ্ছিল। আর নাড়ীভূড়ির যা অবস্থা তাতে স্বয়ং ডাক্তার দীপু পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিল কোন প্যাঁচ লেগে গেল কিনা এই ভেবে।

এই নাগরদোলার মাঝে একবার বাস থামলো খাবার জন্য। সে আরেক অভিজ্ঞতা! যে হোটেলে খেলাম তার তুলনায় আমাদের দেশের

রাস্তার পাশের রেস্টুরেন্টগুলোও যেন ফাইভ স্টার হোটেল। একদিকে প্রচণ্ড ক্ষুধা, আরেকদিকে আমি পেটরোগী। কিন্তু 'উপায় নেই গোলাম হোসেন!' জান বাঁচানো ফরজ, তাই এ রেস্টুরেন্টে খেতেই হবে। মনে মনে 'দোয়া ইউনুস' পড়ে খেতে বসলাম। সব্জি-ডাল-ভাত। এমন সব্জি আমি জীবনে খাইনি। এটা খাওয়ার সময় মনে হলো আমি একটা ছাগল এবং নিবিষ্ট মনে ঘাস চিবিয়ে খাচ্ছি। ডাল খেতে গিয়ে ভাবলাম আমাদের দেশে হলগুলোর ডাইনিং-এর ডালকে মনে হবে এর তুলনায় সাংঘাতিক ঘন। আর ভাত? পাঠক! দয়া করে এ ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। তারপরও খাচ্ছি আর ভাবছি আম্মার কথা। আমার পেটের ব্যাপারে আমার থেকে তাঁর চিন্তাই বেশি। এ খাবার আমাকে খেতে দেখলে বোধ হয় সাথে সাথেই অজ্ঞান হয়ে যেতেন।

খেয়ে ওঠে আরেক বিড়ম্বনা। বাস ছাড়ার নাম নেই। খবর নিয়ে জানলাম আমাদের ড্রাইভার মহোদয় মনের আনন্দে সুখনিদ্রা যাচ্ছেন। পুরো রাস্তাতেই লক্ষ্য করলাম কারণে-অকারণে বাস থামছে। কোথাও ড্রাইভার ঘুমুচ্ছে, কোথাও থেমে ব্যায়াম করে নিচ্ছে, আবার কোথাও গোছল করে নিচ্ছে। এছাড়া চা খাবার জন্য একবার থামলেই আধা ঘন্টা। 'হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা' এ আরবি প্রবাদটির প্রভাবেই বোধহয় এত সময় নিচ্ছিল ড্রাইভার। আমার থেকে বেশি বিরক্ত হচ্ছিল দীপু। দেরি ওর একেবারেই সহ্য হয় না। কিন্তু ড্রাইভার সালমান অথবা কেনেডি নয় যে 'তাড়াতাড়ি' বলবে আর অমনি ঝটপট চলা শুরু করবে। নিজের দূরবস্থা ভুলে দীপুকে শান্ত্বনা দিতে মন চাইলো। আমাদের গত ট্যুরে যখনই আমরা মন খারাপ করে বসে থাকতাম তখনই মোশতাক একটি চমৎকার হাসি দিয়ে হয় কোন গল্প বলতো, নয়তো আরবি, উর্দু, ফার্সি বা সংস্কৃত কোন শ্লোক শুনিয়ে আমাদের বিষন্নতা দূর করতো। এবারের ভ্রমণে মোশতাকের কোন বিকল্প আমাদের ছিল না। এমন পরিস্থিতি সামাল দেবে কে? হঠাৎ আমার একটি ফার্সী প্রবাদ মনে পড়লো। মোশতাকের মতোই সফল হবো এ আশায় দীপুকে উদ্দেশ্য করে বললামঃ

দোস্ত ঘাবড়াসনা! ফার্সিতে একটা প্রবাদ আছে, 'দের আয়দ দুরস্ত আয়দ' অর্থাৎ যা ধীরে সুস্থে আসে তাই মঙ্গলকর। সুতরাং আমরা আস্তে ধীরে কাঠমুণ্ডু পৌঁছলে ক্ষতি কি?

কথা বলল না দীপু। বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে যেন। শুধু একটু তাকাল আমার দিকে। আর তাতেই যা বুঝার বুঝে নিলাম আমি। হয়নি! তেত্রিশ মার্কও জোটেনি। ওষুধে উল্টো কাজ হয়েছে।

ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছে সে। অবাক ব্যাপার তো! একই কথা মোশতাক বললে হাসিতে গড়াগড়ি খাবে আর আমি বললে গাল ফুলাবে? তবে কি 'grammar' অনুযায়ী বলতে পারিনি? না! এবার দেশে গিয়ে মোশতাকের কাছ থেকে শিখতেই হবে শ্লোক শুনিয়ে হাসাবার কায়দাটা।

আমাদের ম্যারাথন বাসভ্রমণ শেষ হলো 'মাত্র' তিন ঘন্টা লেট করে। অর্থাৎ দুপুর একটায় পৌঁছলাম কাঠমুণ্ডুতে। বাসস্ট্যান্ড থেকে যাব ললিতপুর সিটিতে দীপুর দাদার বাসায়। অটো নিলাম। নতুন যাত্রী পেলে যা হয় তাই। ১৫ রুপীর রাস্তা ৪০ রুপী নিল। একেবারে 'রাম' ঠকা যাকে বলে। প্রতিজ্ঞা করলাম তিনজনই, পারতপক্ষে আর অটো চড়বো না কাঠমুণ্ডুতে। কারণ কোন এক গুণীজন বলেছেন, 'একবার ঠকলে ঠকের দোষ, দু'বার ঠকলে তোমার দোষ।' সুতরাং আর হাঁটা নয়, '১১ নং বাস' অর্থাৎ দুই পা জিন্দাবাদ।

বাসা চিনতে বেগ পেতে হলো না। পূজোর ছুটিতে দাদা দেশে গেছেন। দীপুকে এমনভাবে ঠিকানা লিখে ও এঁকে দিয়েছেন যে অতি সহজেই পেয়ে গেলাম। ললিতপুর হোটেল হিমালয়ের একদম কাছে। দাদার বাড়িতে কেউ নেই। আছে শুধু কাজের ছেলে কৃষ্ণা। তাকে আগেই বলে রেখেছিলেন তিনি। তাছাড়া দীপুর হাতে বাড়ীওয়ালাকে একটা চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন তিনি। ফলে অসুবিধা হলো না কোন।

ছোট্ট ছিমছাম বাসা। দুটো বেড রুম, একটি বিশাল ড্রয়িং রুম ও একটি বড় কিচেন। চমৎকার বাসাটি। খুব ভাল লেগে গেল প্রথমেই। ভাল লাগল কৃষ্ণাকেও। বয়স ২০/২২ হবে, অত্যন্ত কর্মঠ। মুখে সবসময় হাসি লেগেই আছে। বেশ আপন করে নিল আমাদের। ২১ ঘন্টা বাস জার্নি এতই কাবু করেছিল যে এই প্রথম মনে হলো আমরা নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডুতে অবস্থান করছি।

সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লেখার জন্য বিপাকে পড়েছিলেন আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক পটভূমি দেবেন কিনা। মুজতবা আলীরই যদি এ অবস্থা হয় তবে আমার অবস্থাটা কল্পনা করুন? ইতিহাস বিষয়টা খুবই আকর্ষণীয়। কিন্তু ইতিহাসে আমার দৌড় কতটুকু তা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে? কিন্তু নেপাল ভ্রমণের কথা লিখব আর নেপালের ইতিহাস তাতে থাকবে না তা তো

হয় না! তাই কিছু পড়াশুনা করতে হলো এবং তারই আলোকে সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

নেপালের প্রাচীন ইতিহাস তেমন স্পষ্ট নয়। খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ সালে সম্রাট অশোক নেপাল এসেছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় কাঠমুণ্ডুর অদূরে পাটান শহরের কিছু মন্দিরে। এরপর যে সময়ের কথা জানা যায় তা হচ্ছে খ্রিস্ট-পরবর্তী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে। সে সময় নেপালের রাজা ছিলেন বর্ষা দেব। তাঁর পরে শাসনভার গ্রহণ করেন তাঁর পুত্র মানা দেব। সে সময় চারিদিকে অসন্তোষ দেখা দিলেও মানা দেবের পুত্র মাহি দেব এবং তার পুত্র শিব দেবের সময় নেপালের বেশ বিস্তৃতি ঘটে। শিব দেব তাঁর মেয়ে বিয়ে দেন অমশুবর্মার [৫৯৫-৬৪০ খ্রি.] কাছে এবং তাঁর কাছেই পরবর্তীতে রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত করেন। নেপালের বিভিন্ন প্রাচীন কীর্তি ও মন্দিরের গায়ে লিখিত তথ্য অনুযায়ী অমশুবর্মাকে একজন বীর যোদ্ধা হিসেবে জানা যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দেব পরিবার নেপাল শাসন করে। এরপর মল্লা পরিবারের হাতে ক্ষমতা চলে যায়। প্রথম 'মল্লা' রাজা ছিলেন অরি দেব। এরপর বংশানুক্রমে অভয় দেব, জয় দেব, জয় স্থিতি মল্লা, জ্যাতি মল্লা রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৪২৭ সনে জ্যাতি মল্লার প্রথম পুত্র ইয়ক্ষা মল্লা রাজা হন। তাঁর ছিল তিন পুত্র। তিনজনই রাজা হবার দাবী করলে নেপালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। পাটান, ভতগাঁ ও কাঠমুণ্ডু - এই তিন রাজ্যে তিন ভাই শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মল্লা পরিবারের শেষ শাসক জয় প্রকাশ ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

এতদিন পর্যন্ত গুর্খারা নেপালে সাধারণ নাগরিক হিসেবে বসবাস করে আসছিল। রাজা জয় প্রকাশের সময়েই রাজপুত বংশোদ্ভূত গুর্খা রাজা পৃথিবী নারায়ণ তৎপর হয়ে ওঠেন। ১৭৫৬ সালে তিনি পাটান ও ভতগাঁ ঘেরাও করেন। প্রথমে পাটান, তারপর ভতগাঁ এবং সবশেষে কাঠমুণ্ডু গুর্খাদের দখলে আসে। পৃথিবী নারায়ণ বিভক্ত তিন রাজ্যকে পুনরায় একত্রিত করেন এবং নিজেকে একীভূত নেপালের রাজা ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর নামের সাথে 'শাহ' নামটি যুক্ত করেন এবং যখন পৃথিবী নারায়ণ শাহ পরলোকগমন করেন তখন তাঁর পুত্র রানা বাহাদুর শাহ ছিলেন একেবারে ছোট। ফলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজার অভিভাবক হিসেবে তাঁর চাচা বাহাদুর শাহ্ দেশ চালাতে থাকেন। রানা বাহাদুর শাহ্ বড় হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং চাচাকে ক্ষমতাচ্যুত করে বন্দী করেন।

রানা বাহাদুরের প্রথমা স্ত্রী রাণী ত্রিপুরার কোন সন্তান না হওয়াতে রাজা আবার বিয়ে করেন। কিন্তু ক্ষত্রীয় বংশীয় রাজার একজন ব্রাহ্মণ মেয়ে বিয়ে করাটা ছিল নেপালী আইনে নিষিদ্ধ। এ ঘরে তাঁর একটি ছেলে হয় এবং একেই তিনি পরবর্তীতে রাজা বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় রাজা রাণী ত্রিপুরাকে নিয়ে বনবাসে আত্মগোপন করেন।

রানা বাহাদুরের পুত্র পালিয়ে যাওয়াতে তাঁর পুত্র গির্বন যুদ্ধ অল্প বয়সেই রাজা হন। কিন্তু সে সময় দেশ শাসন করেন মূলত ভিম বাহাদুর সেন থাপা। বহুদিন পর্যন্ত এই থাপা পরিবার নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ চালান। গির্বন যুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র বিক্রম শাহ রাজা নিযুক্ত হন। রাজা রাজেন্দ্র জং বাহাদুর থাপাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে তাঁর উপরই শাসনভার ন্যস্ত করে নিজেকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেন। ১৮৫৭ সালে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় জং বাহাদুর ইংরেজদের সাহায্যার্থে তিন হাজার নেপালী সৈন্য ভারতে পাঠান। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ইংরেজরা নেপাল-ভারত সীমান্তের তেরাই অঞ্চলের বিরাট অংশ নেপালকে দান করেন।

রাজা রাজেন্দ্রের ছেলে ত্রৈলক্য বিক্রম শাহ্ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মহারাজা চন্দ্র শ্যাম শেরের সাথে রাজার বিরোধ গড়ে উঠে। যাই হোক, প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শ্যাম নেপালে কতকগুলো আইনগত বিপ্লব ঘটান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সতীদাহ প্রথার নিষিদ্ধকরণ ও দাস আইন বাতিল করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ও ইংরেজদের সহায়তায় নেপাল এগিয়ে আসে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে।

১৯৪০ সালের কথা। নেপালের রাজা তখন ত্রিভুবন। এ সময় তৎককালীন নেপালী প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাঁকে সহায়তা করার দায়ে রাজাকে অভিযুক্ত করে। রাজা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিস্থিতির সামাল দেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ সালে প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ শ্যাম শের স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে নেপালের ইতিহাসে নতুন নজীর সৃষ্টি করেন।

রাজা ত্রিভুবন উপলব্ধি করেন যে রাজা হিসেবে তাঁর দেশ চালানোর কোন ক্ষমতা নেই। তিনি একবার আফসোস করে বলেন, "আমি একটি নাম আর কিছুই নয়, নেপাল তো রানা বংশ শাসন করে। আমি একজন বন্দীমাত্র। পাঁচটি বন্ধ ফটকের ভেতর আটক আমি। এসব ফটকে প্রহরী

আছে। না, আমাকে রক্ষার জন্য নয়, আমি যাতে পালাতে না পারি সে জন্য।"

রাজার আত্মোপলব্ধি শেষ পর্যন্ত নেপালের শাসনতন্ত্রে বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়। অবশ্য এর পেছনে এরিকা লিউচটাস নামক এক জার্মান ডাক্তারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। একদা তিনি রাজাকে বলেছিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি কেন নিশ্চুপ বসে আছেন? আপনার দেশের জনগনের কল্যাণার্থে আপনার কোন আগ্রহই কি নেই?'

১৯৫০ সালের ৬ নভেম্বর সকালে ঘটে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। রাজপরিবার সেদিন রাজা ত্রিভুবনের নেতৃত্বে পাহাড়ে শিকার করতে বের হয়। সেখানে সুযোগ পেয়েই রাজা নিকটবর্তী ভারতীয় দূতাবাসে প্রবেশ করে। নেপালী প্রধানমন্ত্রী সাথে সাথে দূতাবাস ঘেরাও করলেও আন্তর্জাতিক চাপ ও ভারতের হুমকির মুখে রাজাকে নিরাপদে ভারতে যেতে দিতে বাধ্য হন। রাজা সেখানে বিদ্রোহীদের সাথে একত্রিত হয়ে ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রানাদের পরাজিত করেন এবং রাজপরিবারের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন।

রাজা ত্রিভুবনের মৃত্যু হয় ১৯৫৫ সালের ১৩ মার্চ। তারপর তাঁর পুত্র ও দৌহিত্র্য যথাক্রমে রাজা মহেন্দ্র বীর বীক্রম শাহ এবং রাজা বীরেন্দ্র শাহ পূর্ণ দাপটে দেশ শাসন করেন। তবে অতি সম্প্রতি আবারও নেপালে সরকার পদ্ধতি পরিবর্তিত হয় এবং দেশ সংসদীয় পদ্ধতির দিকে চলে যায়। রাজা এখন আবার রাজপ্রাসাদে সীমাবদ্ধ এবং প্রধানমন্ত্রী দেশ চালানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। তবে নেপালের জনগণের সাথে আলাপ করে মনে হলো তারা এ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে মেনে নিতে পারছে না এবং রাজপরিবার আবারও দেশ চালানোর দায়িত্বে নিয়োজিত হোক এটাই চায়।[1]

গোসল সারতে না সারতেই দেখি কৃষ্ণা টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখেছে। খাওয়ার পর নামায পড়তে আলসেমি লাগে, তাই ঝটপট আল্লাহর দেয়া concession কাজে লাগিয়ে নামায সেরে ফেললাম। [মুসাফির হিসেবে দু'রাকাত নামায]। অল্প সময়ে কৃষ্ণা যা রান্না করেছে তার তুলনা হয় না। ভাত, ডাল এবং সব্জি। খেতে গিয়ে বোঝা গেল

[1] এর মধ্যে নেপালে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে। তবে যেহেতু এই লিখাটি ১৯৯৪ সালে লিখা হয়, তাই এর কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

বয়স অল্প হলে কি হবে, রান্নার কলাকৌশল কৃষ্ণা ভালভাবেই আয়ত্ব করেছে। গতরাতের তিক্ত অভিজ্ঞতা, দাদার বাসার চমৎকার পরিবেশ, গোসলের পর সতেজ শরীর সব একাকার হয়ে কৃষ্ণার তৈরি খাবারের স্বাদ শতগুণে বাড়িয়ে দিল। একেবারে গলা পর্যন্ত খেলাম।

দাদা আসবেন দু'দিন পর। সুতরাং এ সময় পোখরা ঘুরে আসাটাই ভাল। নেপালের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা পোখরা। পোখরা না দেখলে নেপাল নাকি দেখাই হয় না। গতকালের অভিজ্ঞতা দাবী করছিল একটু বিশ্রামের। কিন্তু দীপুর চেচাঁমেচির ঠেলায় বিকেলে বেরিয়ে পড়তে হলো। কারণ কাল সকালের জন্য পোখরার টিকেট না পেলে বেকায়দা পড়ে যাব। রওয়ানা দিলাম 'সুন্দরা' বাসস্ট্যান্ডের দিকে। কাঠমুণ্ডুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এটি। আমাদের বাসা থেকে চার কিলোমিটার দূরে। তাতে কি? হেঁটেই রওয়ানা হলাম। আবারও অটোকে পয়সা দেব? উহু! তা হবার নয়। সেদিন থেকেই কাঠমুণ্ডুতে যতদিন থেকেছি প্রতিদিন গড়ে ১৫/২০ কিলোমিটার হেঁটেছি। আর সত্যি করে বলছি, এতটুকু খারাপ লাগেনি হাঁটতে।

ফেরার সময় পথ ভুলে করে অকে বেশি হাঁটতে হয়েছে। বাসায় পৌছে দেখি কেনেডি ভাই কৃষ্ণাকে নিয়ে বাজার করে এসেছেন। কৃষ্ণা বোধ হয় যাদু জানে। পনের মিনিটের মধ্যে টেবিলে খাবার লেগে গেল। খেয়ে নামায পড়েই শুয়ে পড়লাম।

রাতে আবারও কাঞ্চনজঙ্ঘাকে স্বপ্নে দেখলাম। আরও স্পষ্ট! আরও শুভ্র! আও সুন্দর! বুঝতে পারলাম, কাঞ্চনজঙ্ঘা কেন 'কাভি আল বিদা না ক্যাহনা' বলেছিল। আমাদের প্রেমকাহিনী এখনও শেষ হয়নি। স্বপ্নে এর রেশ রয়ে গেছে এখনও।

অপূর্ব অন্নপূর্ণা রেঞ্জ

১৬ অক্টোবর '৯৩। ৭টায় আমাদের বাস। তাই সাড়ে পাঁচটায় দিপু উঠে হৈচৈ শুরু করে দিল। আমাকে লেপের তলা থেকে তুলতে গিয়ে বেচারার অবস্থা কাহিল। দীপু দাদার কাছে শুনেছে নেপলীরা নাকি 'আলসের ঠাকুর'। কিন্তু দীপুর মতে আমি, 'আলসের ঠাকুরদা'। দীপুর সাথে যোগ দিয়েছে কেনেডি ভাই। তাদের মুহুর্মুহু আক্রমণে আমার রক্ষণব্যুহ তছনছ হয়ে গেল। রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হলাম। আমার সাথে তো পেরেছে। কিন্তু টিপুর সাথে কি পারতো? টিপু চট্টগ্রামের ছেলে। আলীগড়ে থার্ড ইয়ারে পড়ে। বাবা আবুধাবী থেকে পেট্রোডলার পাঠায়। আর তা দিয়ে সে দু'বেলা দিব্যি 'চিকেন' খায় আর নাক ডেকে ঘুমায়। এমনিতে ছেলেটি দারুণ ভাল। খুব কম কথা বলে এবং একটুতেই হাসে। কিন্তু সকাল হলে সে অন্য টিপু। তার ঘরে বোমা ফাটলেও সে উঠবে না। বড়জোর চোখ দু'টি খুলে একটু বিরক্তি প্রকাশ করবে। তাকে লেপের তলা থেকে উঠিয়ে সকালের ক্লাসে নিয়ে যাবে এমন বান্দার আবির্ভাব আলীগড়ে ঘটেনি। আর মাশা আল্লাহ যা স্বাস্থ্য, ওর সাথে পেরে উঠবে সে সাধ্য কার? হায় টিপু! এই সাত সকালে ওঠে ওদের অত্যাচারে তোমার কথাই মনে পড়ছে বেশি করে। তোমার মতো যদি হতে পারতাম? তবে লেপের তলায় আমার নিদ্রা ঠেকায় কে?

৭টার বাস ছাড়লো সাড়ে সাতটায়। বাসেই পরিচয় হলো পাঁচজন বাংলাদেশীর সাথে। দীপু, রাহিদ, শাকিল, ফরহাদ ও টুটুল। সবাই ছাত্র। দু'জন ময়মনসিংহ মেডিকেলে, দু'জন বরিশাল মেডিকেলে ও একজন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ওরাও আমাদের মতো ঘুরতে এসেছে। আমাদের দীপু ডাক্তার শুনে তো ওরা মহা খুশি। একই লাইনের লোক পেয়ে গেছে। ছেলেগুলো বেশ মজার। সারাক্ষণ হৈচৈ করতে ভালবাসে। ভালই লাগল ওদের। তবে আমোদ-স্ফুর্তি যে একটু বেশি করে তাও বোঝা গেল। সে যাক। এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

পরশু রাতের জার্নিতে কেনেডি ভাইয়ের গানের খেই হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল। এবার ফর্ম ফিরে পেলেন তিনি। যথারীতি আমাদের ভ্রমণ সঙ্গীত শুরু হলো। বাসে চলতে চলতেই আমরা গানের একটা মজার খেলা খেললাম। একে বলা হয় 'অন্তক্ষরি'। একদল গান গেয়ে যে অক্ষরে থামবে সে অক্ষর দিয়েই অপর দলকে আর একটা গান ধরতে

হবে। খুব জমল খেলাটা। শেষ পর্যন্ত কেউই হার মানল না। হার মানল আমাদের শক্তি। অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো আমাদের প্রতিযোগিতা।

পোখরায় পৌঁছে বাসস্ট্যান্ডের পাশেই একটা হোটেলে উঠলাম। আমরা তিনজন এক কামরায় আর ওরা পাঁচজন এক কামরায়। বেশ সস্তা। ১০০ নেপালী রুপী অর্থাৎ ৬০ ভারতীয় রুপী। নেপালে ভারতীয় ও নেপালী দু'দেশের মুদ্রাই চলে। এখানে ভারতীয় মুদ্রা 'IC' এবং নেপালী মুদ্রা 'NC' নামে অভিহিত করা হয়। ১০০ ভারতীয় রুপীতে ১৬০ নেপালী রুপী পাওয়া যায়।

বিকেলে আমরা ৮ জন 'ফেওয়া' লেকে গেলাম। সেখানে ওরা পাঁচজন আলাদা হয়ে গেল এবং আমরা তিনজন নৌকা চালালাম। ভাড়া নিল ঘন্টায় ৮০ 'NC'। কেনিডে ভাইই নৌকা চালাচ্ছেন। বেশ এক্সপার্ট বোঝা গেল। একটি মেয়ের তাচ্ছিল্যে ভরা উক্তি তাকে বাধ্য করে নৌকা চালানো শিখতে। এখানে একটা কথা বলে রাখি। কেনেডি ভাইয়ের একটা 'Lady Killer' ইমেজ আছে। মৌমাছির মতো মেয়েরা তাঁর কাছে ভিড়ে। কিন্তু কেনেডি ভাই তাদের তেমন পাত্তা দেন না। কিন্তু ইদানিং একটি মেয়ে যে তাঁকে কিছুটা হলেও কাবু করে ফেলেছে তা তাঁর কথাবার্তাতেই বোঝা যায়।

লেকের মাঝখানে আমরা। নীল স্বচ্ছ পানি। চারিদিকে পাহাড়। সূর্যিমামা পাহাড়ের আড়ালে লুকোবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। চারিদিকে এক স্বর্গীয় পরিবেশ। কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধুমাত্র কেনেডি ভাইয়ের হাতের বৈঠা ও পানির সংঘর্ষে 'ছলাৎ' 'ছলাৎ' শব্দ হচ্ছে। দীপুও মাঝে মাঝে বৈঠা চালাচ্ছে। আমি গান ধরলাম।

"নাইয়ারে---- নায়ের বাদাম তুইলা

কোন দূরে যাও চইলা----"

আমার মুখ থেকে গানটি একপ্রকার ছিনিয়ে নিয়েই গানটি গাইতে থাকলেন কেনেডি ভাই। এরপর একে একে আরও কয়েকটি গান গাইলেন তিনি। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম আমি। দীপু বৈঠা চালাচ্ছে। কেনেডি ভাই গান গাচ্ছে, আর আমি ফিরে গেলাম আমার ছোটবেলায়। মনে পড়ে গেল সেই বহু বছর আগে নৌকা করে আমাদের গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার কথা। গ্রামের বাড়ি কমই গিয়েছি। কিন্তু মেঘনা নদীর বুক চিরে নৌকায় করে বাড়ি যাবার সেই মধুর স্মৃতিগুলো এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আসলে ছোটবেলার দিনগুলো কি চমৎকারই না কাটে! পার্থিব জীবনের সমস্ত জটিলতা থেকে মুক্ত থাকে

মন। নৌকা ভ্রমণই হোক, কাগজের নৌকা বানিয়ে খেলাই হোক সবকিছুতেই থাকে এক উচ্ছল আনন্দের ছোঁয়া। তাই জগজিৎ সিং-এর এ গানটি আমার এত প্রিয়।

"ইয়ে দাওলাত ভী লে লো, ইয়ে শোহরত ভী লে লো,
ভালে ছিন লো মুঝসে মেরি জাওয়ানী,
মাগার মুঝকো লওটা দো বাচপান কি সাভন
উয়ো কাগজ কি কাশতি, উয়ো বারিষ কা পানি।"

"হে প্রভু আমার ধন-দৌলত, খ্যাতি, যৌবন সব ছিনিয়ে নাও।
বিনিময়ে শুধু ছোটবেলার সে দিনগুলো ফিরিয়ে দাও
যখন আমি শ্রাবণের দিনগুলোতে কাগজের
নৌকা বানিয়ে খেলতাম।"

কেন বড় হলাম? কেন আজ বৃষ্টিতে ভিজতে সাধ হয় না? কেন কাগজের নৌকা বানিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে হাততালি দিতে পারি না? কেন প্রতি রাতে আম্মার বুকে মাথা রেখে ঘুমপাড়ানী গান শুনতে পারি না? কেন ছোট্ট বাচ্চার মতো তাঁর কোলে ঘুমিয়ে যেতে পারি না? কেন আজ এই পার্থিব জীবনের তাগিদে আব্বা-আম্মা, বন্ধু-বান্ধবদের ফেলে হাজার মাইল দূরে আলীগড়ে কষ্ট করছি? কেন?

লেকের মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ আছে। একটা মন্দির দেখলাম সেখানে। মন্দির দেখে যখন ফিরছি, ততক্ষণে চাঁদের আলো তীব্র হয়ে পড়েছে লেকের উপর। অপরূপ এক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমাদের ছোট্ট নৌকাটি ফিরে চলল ঘাটের দিকে। ঘাট ফিরে লেকের পাড়ে একটি উঁচু প্লাটফর্মের উপর বসলাম। জোছনা রাত! পাশে লেক। গল্পের জন্য চমৎকার পরিবেশ। এসব পরিবেশে মানুষ নিজের প্রিয় কিছু মানুষকেই স্মরণ করে বেশি। আমরাও স্মরণ করলাম তেমনই কিছু প্রিয় মানুষকে। স্মরণ করলাম আমাদের বন্ধুদের। কেনেডি ভাই বললেন তাঁর বন্ধুর কথা। আমি ও দীপু যে কমন-বন্ধু সম্পর্কে আলোচনা করলাম, সে হলো বাবু। বাবু মূলত আমার স্কুল ফ্রেন্ড। আমার মাধ্যমেই দীপুর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা। কি বলব ওর কথা? বন্ধুর জন্য মানুষ এত করতে পারে তা বাবুকে না দেখলে বোঝা যাবে না। পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে একসময় বাধ্য করেছিল ছাত্রলীগ [মন্টু] গ্রুপে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে। কিন্তু তখনও কোন বন্ধুর বিপদে সে বসে থাকেনি। দীপু একবার মেডিকেল পরীক্ষা না পেছানোর দাবীতে অটল থাকার ফলে

মাস্তানদের টার্গেটে পরিণত হয়েছিল। বাবু সেই উত্তপ্ত পরিবেশে দীপুকে রক্ষা করেছে। শুধু তাই নয়, কারও বাসার ফেলিফোন লাইন কেটে গেছে? বাবু আছে তাদের সাহায্যার্থে। কেউ বাড়ি বানাতে গিয়ে চাঁদাবাজদের সম্মুখীন? বাবু আছে উদ্ধার করতে। কারও মনের মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক নেতা দ্বারা উত্যক্ত? বাবু আছে তার ইজ্জত রক্ষার্থে। আমার জন্যও কি কম করেছে সে? আমার ব্যক্তিগত কোন কাজ থাকলে ওর আন্তরিকতা দেখে মনে হবে এটি ওরই কাজ। আর ওর Sense of Humour দারুণ! ওর সাথে পাঁচ মিনিট কথা বললেই হাসতে হাসতে আমার পেট ফাটার উপক্রম হবে। বাহ্যিক দিক দিয়ে আমি ও বাবুর মধ্যে কোন ধরনের মিল নেই। অনেকে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্নও করেছে এ দুটি আপাত: দু'মেরুর দু'যুবকের মধ্যে এত গভীর সম্পর্ক কিভাবে থাকে? আসলে আমাদের দু'জনের বাহ্যিক সাদৃশ্য না থাকলেও অন্তরের সাদৃশ্য খুব বেশি। মনের দিক থেকে আমি ও বাবু এক ও অভিন্ন সত্তা।

এছাড়া আরও অনেক গল্প হলো। কিন্তু ঘড়ির কাটা স্মরণ করিয়ে দিল আমাদের হোটেলে ফিরতে হবে। হোটেলে ফেরার সময় বাংলাদেশী অপর গ্রুপটির সাথে আবার দেখা হয়ে গেল। তাদের সাথে গল্প করতে করতে হেঁটেই চললাম হোটেলের দিকে। তারপর খেয়ে নামায পড়েই ঘুম।

শুনেছি পোখরা থেকে নাকি হিমালয়ের অনেকগুলো চূড়া অত্যন্ত কাছে দেখা যায়। এত কাছ থেকে এত বড় জায়গা জুড়ে এতগুলো চূড়া দেখা পৃথিবীর আর কোথায়ও সম্ভব নয়। মাত্র ২৮ কিলোমিটার দূরের এক বিরাট 'রেঞ্জ'-কে বলা হয় 'Annapurna Range'। কেনিডি ভাইয়ের সবকিছুতেই আগ্রহ। তাই ফজরের নামায পড়েই উনি হোটেলের ছাদে ওঠে গেলেন এ দৃশ্য দেখার আশায়। আর আমরা দু'জন দ্বিতীয় ইনিংসের জন্য ঘুমিয়ে গেলাম।

৭টার সময় কেনেডি ভাই এসে রীতিমত চিৎকার শুরু করে দিলেন। ছাদ থেকে যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে তা নাকি কল্পনারও অতীত। ধড়মড় করে ওঠে হাত-মুখ না ধুয়েই ওঠে গেলাম চাদে। সুবহানাল্লাহ! এ কি দেখছি আমি? বিশাল উঁচু উঁচু বরফের চাকা। পোখরা শহরের উত্তরপার্শ্বের বিরাট জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়ের চারটি বড় বড় চূড়া। একেবারে ডান পার্শ্বের শৃঙ্গের নাম ধ্বলগিরি। এর পরেরটার নাম অন্নপূর্ণা। সর্বডানে রয়েছে নীলগিরি। আর অন্নপূর্ণা ও নীলগিরির

মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে 'মাছাপুছরে' বা ফিস টেইল। এই শৃঙ্গটি দেখতে অনেকটা মাছের লেজের মতো তাই এ নামকরণ করা হয়েছে। নেপালী ভাষায় মাছকে 'মাছা' এবং লেজকে 'পুছরে' বলা হয়। সবগুলো শৃঙ্গকে একত্রে বলা হয় 'অন্নপূর্ণা রেঞ্জ'। চূড়াগুলো এত কাছে দেখা যাচ্ছে যে মনে হয় হাত বাড়ালেই ধরতে পারব।

শরৎচন্দ্রের ভাষায় আমিও বলে উঠলাম, 'ভগবান এ চোখ দুটো তুমিই দিয়েছ, আজ তুমিই তাকে সার্থক করলে।' অপূর্ব, অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়, অভূতপূর্ব - যত বিশেষণই দিই না কেন এ সৌন্দর্যের আশানুরূপ বর্ণনা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। কাঞ্চনজঙ্ঘা আমাকে আলোড়িত করেছে, আবেগাপ্লুত করেছে। কিন্তু 'অন্নপূর্ণা রেঞ্জ' কম কিসে? থরে থরে সাজানো বরফের পাহাড়গুলো সূর্যের আলোতে চকচক করছে। আশেপাশে ছোট ছোট মেঘের কুণ্ডলী দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো যেন বরফ থেকে নির্গত ধোয়া। খালি চোখে দেখলাম, বাইনোকুলার দিয়ে দেখলাম। একটার পর একটা ছবি তুললাম। কিন্তু তারপরও মনে হলো দেখার সাধ পুরোপুরি মিটল না।

এই যে এখন সে অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখছি, অপূর্ণতার বেদনা কি তার মধ্যে নেই? আপনারা যখন আমার লেখা পড়ছেন তখনও কি আমার সাধ পূর্ণতা পেয়েছে? 'অন্নপূর্ণা রেঞ্জ' দেখার সাধ কখনও মিটবে না, তা সে যতবারই দেখি না কেন। ছোটগল্পের মতোই 'শেষ হয়েও হয় না শেষ' এর আবেদন।

Sight Seeing-এর বাস ছাড়তে দেরি করল। দশটায় রওয়ানা হলাম পোখরা শহর পরিদর্শনে। প্রথমেই আমাদের নিয়ে গেল বিন্দুবাসীনী মন্দিরে। আমাদের গাইডটি বলল, এ মন্দিরের মূর্তিটি রাজা মহেন্দ্র মির্জাপুর থেকে এনেছিলেন। পরে অনেক চেষ্টা করেও নাকি এ মূর্তি সরাতে পারেননি তিনি। ফলে সেখানে একটি মন্দির স্থাপন করেন। মন্দিরে একটি কচ্ছপ আছে যা ৩০০ বছর আগের বলে দাবী করা হয়। কিন্তু গাইডের সব দাবী-ই সত্য না বলে কিংবদন্তী বলাই ভাল।

দ্বিতীয় গন্তব্য ছিল মহেন্দ্র গুহা। অত্যন্ত প্রাচীন। আনুমানিক ৩০০ বছরের পুরনো বলে এরা দাবী করে। অবশ্য এ দাবীরও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। এই প্রথম কোন গুহার ভিতর প্রবেশ করলাম। গা ছমছম করছিল। অবশ্য জায়গায় জায়গায় বাতি লাগানো ছিল। গুহার ভেতর দিয়ে হাঁটছি আর উপর থেকে টপটপ পানি পড়ছে গায়ে।

গাইড বলেছে যে, গুহার চারিপাশ থেকে হঠাৎ করেই দেবী মূর্তি বা সাপ বেরিয়ে পড়ে। কথাটা বিশ্বাস করিনি এক বিন্দুও। তারপরও কেন জানি একটু ভয় ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল এই বুঝি একটি পদ্মগোখরা বেরিয়ে নেপালী ভাষায় বলে উঠবে, 'তাপাঈ লাই কাস্তো ছা'? অর্থাৎ 'কেমন আছ মিস্টার'? অথবা টকটকে লাল জিহবা নিয়ে বেরিয়ে আসবে কালীর মূর্তি। এমনিতে আমি মোটেই ভীতু প্রকৃতির নই। এমনকি গ্রামে বেড়াতে হারিকেন হাতে রাত ১২টায় টয়লেটে যাওয়ার সময়ও তেমন ভয় পাই না। তারপরও কেন জানি এ গুহায় বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করল না। দীপু ও কেনেডি ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি।

এরপর গেলাম 'সেতি গর্জ'। গর্জন থেকে 'গর্জ' শব্দটি এসেছে। 'মাছাপুছরে' থেকে দুটি নদী এসেছে। একটি সাদা ও একটি লাল। সাদা নদীটি পোখরা এসে নিচের দিকে চলে গেছে। ব্রিটিশরা একটা বাঁধ দিয়ে এই পানি লেভেল উঁচু করেছে চাষবাসের সুবিধার্থে। আমরা সেই উঁচু লেভেলের পানি-ই দেখতে পেলাম। অনেক নিচে দেখা গেল আসল নদীটি। নদীটি প্রচণ্ড স্রোতবাহী। তাই এর গর্জনের শব্দ বেশ তীব্র। এ কারণেই এর নামকরণ করা হয়েছে সেতি গর্জ।

লাঞ্চের আগে সবশেষে গেলাম 'ডেভিস ফল'-এ। ওরা বলে 'পাতালে সাঙ্গ'। এ জলপ্রপাতটির ব্যাপারেও একটি গল্প শোনাল আমাদের গাইড। অনেক অনেক আগে তিনজন বিদেশী এখানে এসেছিল। এর মধ্যে 'ডেভিস' নামের একজন মেয়েও ছিল। মেয়েটি হঠাৎ পা পিছলে এ জলপ্রপাতে পড়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। এরপর থেকেই এর নাম রাখা হয় 'ডেভিস ফল'। অবশ্য এ গল্প কতটুকু সত্য জানি না। আমাদের পাঁচ বাংলাদেশী সহযাত্রীদের একজন প্রশ্ন করলো 'ডেভিস শাদি শুদা থি?' হাসির রোল উঠল সকলের।

জলপ্রপাতটি বেশ বড়। স্বচ্ছ পানির উৎস এঁকেবেকে ওঠে গিয়েছে কোন এক পাহাড়ের জগতে। কেউ জানে না কোথা হতে এসেছে এ পানি। জানে না কোথায় গিয়ে থামবে তার যাত্রা! কবি মতিউর রহমান মল্লিক তাই এ জলধারার ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে জলধারা
আমি তার জানিনা কোন ঠিকানা
মনে হয় হয়তোবা মিশে গেছে অবশেষে
যেখানে নীল নীলিমার সীমানা।"

একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটল সেখানে। আমাদের পাঁচ সহযাত্রীদের একজনের ক্যামেরার কভার পড়ে গেল পানিতে। পানি যেখানে নিচে নেমে গিয়েছে তার কাছাকাছি এক বড় পাথরে আমরা ছবি তুলছিলাম, সে সময়েই হাত ফসকে পড়ে গেল। পানিতে পড়ে ওটি আটকে গেল কোন কিছুর সাথে। দামী ক্যামেরার দামী কভার। তাই প্রচণ্ড ঝুঁকি নিল ছেলেটি। প্রাণপণে চেষ্টা চালাতে লাগল ওটা উদ্ধারের কিন্তু কিছুতেই নাগাল পাচ্ছিল না। এক পর্যায়ে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সাথের বন্ধুটি ধরে ফেলায় বেঁচে যায় সে যাত্রা। তা না হলে হয়তো ডেভিসের মতোই সে হারিয়ে যেত দূর অজানায়।

সবশেষে গেলাম ফেওয়া লেকে। গত সন্ধ্যার ফেওয়া লেকের সাথে তেমন সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম না। রৌদ্রকরোজ্জ্বল দুপুরের এই লেকের সূর্যরশ্মি এর গ্ল্যামার বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। ঝলমল করছে লেকের পানি। খুব ইচ্ছে করল নৌকা ভ্রমণের। কিন্তু গাইড ব্যাটা বাধ সাধলো। জানালো লাঞ্চের পর 'বেগনাস' লেকে গিয়ে নৌকা চালানো যাবে। আর কি করা? অনিচ্ছাসত্তেও বাসে উঠতে হলো।

লাঞ্চ সারলাম আমাদের হোটেলেই। এরপর আবার বের হলাম। প্রথমেই বুদ্ধ মনাষ্ট্রিতে। এই মনাষ্ট্রিতে উঠতে ৩০৩টি সিঁড়ি পার হতে হয়। খাড়া ৩০৩টি সিঁড়ি। উপরে উঠছি আর সিঁড়ি গুণছি। যখন মনাস্ট্রিতে পৌঁছলাম তখন একেকজনের অবস্থা দেখার মতো। স্ট্যামিনা ফুরিয়ে শেষ। যাই হোক এই মনাস্ট্রি হতে পুরো পোখরা শহর দেখা যায়। আমাদের বাইনোকুলার সাহায্য করল ছোট্ট ছিমছাম পোখরা শহরের aerial view নেয়ার। আশ্রমে প্রচুর ভিক্ষু দেখতে পেলাম। চার-পাঁচ বছরের শিশু থেকে সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই মেরুন রঙের পোষাকে আবৃত। একটি কঠিন জীবনে পদার্পণ করেছে এরা। জীবনে কখনো এরা নারী স্পর্শ করতে পারবে না। কখনও কোন প্রাণী ভক্ষণ করার অনুমতি পাবে না। শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত করতে হবে জীবনের ষোল আনা সময়। মানুষের দেহের জৈবিক চাহিদা তো প্রাকৃতিক ব্যাপার। একে অস্বীকার করা মানে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। এরা কিভাবে তা পারে আল্লাহই জানেন। হিন্দু ধর্মের পুরোহীত অথবা খ্রিস্টান পাদ্রীদের অবস্থাও তদ্রুপ। এ সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে বাধ্য হচ্ছি আমাদের ইসলাম কত বিজ্ঞানসম্মত। জগৎ সংসারকে ত্যাগ করে নয়, পার্থিব জগতের সব স্বাভাবিকতাকে মেনে নিয়েই আল্লাহ প্রদত্ত বিধান এবং রাসুল (স)

প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী জীবনের সকল দিক পরিচালনার শিক্ষাই ইসলামের শিক্ষা।

পোখরা sight seeing-এর সর্বশেষ গন্তব্য' বেগনাস লেক'। কাঠমুণ্ডু থেকে ২ কিলোমিটার দূরে 'বেগনাস' ও 'রুপা' লেক অবস্থিত। সময়ের স্বল্পতার কারণে রুপা লেকে আর যাওয়া হয়নি। বেগনাস লেকটি দু'কিলোমিটার লম্বা ও দেড় কিলোমিটার চওড়া। এখানে সুযোগ পাওয়া গেল নৌকা চালানোর। ওরা পাঁচজন একটা নৌকা ভাড়া করল। আর আমাদের তিনজনের সাথে যোগ হলো এক বৃদ্ধ জুটি। ভদ্রলোক ষাটোর্ধ এবং তাঁর স্ত্রী পঞ্চাশোর্ধ হবেন। মূলত এরা দিল্লীর হলেও এখন তারা বিহার রাজ্যের রাচিতে আছেন। এক প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন ভদ্রলোক। ছুটি কাটাতে এসেছেন নেপাল। খুব ভাল লেগে গেল তাঁদের। তারাও আমাদের বেশ পছন্দ করেছেন বলে মনে হলো। বিশেষ করে কেনেডি ভাইয়ের নেতৃত্বে আমাদের গানের আসর খুব উপভোগ করেছেন তাঁরা। আমাদের গানের সাথে তাল মিলিয়ে হাততালি দিয়ে যাচ্ছেন। কেনেডি ভাইয়ের গলা আজ বেশ খুলেছে। স্কেলের সমস্যাটাও মোটামুটি কাটিয়ে ওঠেছেন। ভ্রমণ-সঙ্গীত দুটোর পরই ধরলেন জগজিৎ সিং-এর একটি রোমান্টিক গান। গানের প্রথম অন্তরাটি দারুণ গাইলেনঃ

"না উমরে কি সীমা হো
না জনমো কা হো বন্ধন
জাব পেয়ার কারে কোঈ
তো দেখে কেবল মান
নাই রীত চালা কার তুম
ইয়ে রীত অমর কার তুম

হোঁটো পে ছু লো তুম
মেরি গীত অমর কার দো।”

সত্যিই কেউ বোধ হয় তার ঠোঁট ছুঁয়ে গানের স্পৃহা অমর করে দিয়েছে। অনবরত গান গেয়ে চললেন কেনেডি ভাই। কোন ক্লান্তি নেই। রোলার স্কেটার তিনি। সামান্য কটা গান গাইলে কি আর তার স্ট্যামিনা ফুরায়? আর খোলা জায়গা পেয়ে তার আবেগ চরমে উঠেছে। আশে-পাশের নৌকাগুলো থেকে সবাই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, ‘ভাইসাব! আপকো তো বোম্বে জানা চাইয়ে থা। আপ নেপাল ক্যায়সে আ গায়া?’

এভারেস্ট দর্শন

হোটেলে ফিরলাম সন্ধ্যার পরপর। সাড়ে আটটার বাসে কাঠমুণ্ডু রওয়ানা হব। তাই অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই। হোটেলের লবিতে আলাপ হলো দু'জন বাঙালি ভদ্রলোকের সাথে। sight seeing এর বাসে তারা আমাদের সাথে ছিলেন। একজনের নাম মনে আছে। এস. ভর, কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাসিস্টেন্ট রেজিস্ট্রার। তাঁরা বেরিয়েছেন ট্রেকিং এ। ট্রেকিং হচ্ছে পায়ে হেঁটে কোন পাহাড়ের পাদদেশে যাত্রা করা। যারা অ্যাডভেঞ্চার করতে ভালবাসে তাদের জন্য ট্রেকিং অত্যন্ত আকর্ষণীয়। দুর্গম পাহাড়ী এলাকার ভিতর দিয়ে আপনি হেঁটে চলবেন। প্রচন্ড শীত, মাঝে মাঝে তুষারপাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে আপনাকে। পেছনে কাঁধে থাকবে হেভার স্যাক। সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবে যে আপনার সরঞ্জামাদী বহন ছাড়াও খাবার তৈরির কাজও করে দেবে। মি. ভর ও তার সাথী যাচ্ছেন অন্নপূর্ণা রেঞ্জের পাদদেশে। সাতদিনের রোমাঞ্চকর অভিযানে তারা 'মাছাপুছরে'র বেস ক্যাম্পে পৌছে যাবেন। এদের জন্য এটা একটা তীর্থযাত্রাও বটে। ওখানে 'মুক্তিনাথ' নামক জায়গায় একটি শিবমন্দির আছে। হিন্দু অভিযাত্রীরা একসঙ্গে ট্রেকিং ও তীর্থযাত্রার তৃপ্তি অনুভব করেন। প্রচুর ট্যুরিস্টের আগমনও ঘটে এই পোখরায় ট্রেকিং-এর জন্য। ফেওয়া লেকের পাশে সারি সারি দোকানে ট্রেকিং-এর সাজসঞ্জাম বিক্রি হচ্ছে। লেকের পাশেই তাবু খাটিয়ে এসব রোমাঞ্চপিয়াসী পর্যটকরা অবস্থান করে। গতরাতে একবার গিয়েছিলাম ওখানে। ক্যাম্পফায়ার করে সেই আগুনের আলোতে অনেক টুরিস্টকে দেখা গেল ট্রেকিং-এর ম্যাপ খুলে খুঁটিনাটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে। গতকাল আমরা ট্রেকিং-এর প্রতি কিছুটা কৌতুহলবশতই গিয়েছিলাম সেখানে। কিন্তু আজ আমাদের প্রায় দ্বিগুণ বয়সী এই দুই ভদ্রলোক এর প্রতি আমাদের রীতিমত আগ্রহী করে তুললেন। দীপুতো অচিরেই কেনেডি ভাইকে নিয়ে ট্রেকিং-এ বের হবে বলে ঘোষণা দিয়ে দিল। কিন্তু দীপুকে আমার চেয়ে ভাল আর কে চেনে? ওকে জিজ্ঞেস করে দেখুন? ট্রেকিং-এর প্রতি তার আগ্রহ আদৌ ছিল তাও বোধ হয় এতদিনে ভুলে বসে আছে। ও যদি সত্যি সত্যি ট্রেকিং-এ বের হয় তবে 'আমার দু'হাতের কব্জি জমা রাখব'। [এ কথাটি কেনিডি ভাইকে প্রায়ই বলতে শুনেছি]।

এক পর্যায়ে দু'অভিযাত্রীর একজন তসলিমা নাসরিনের প্রসঙ্গ তুললেন। আমরা নাকি তসলিমা নাসরিনের উপর অত্যাচার করছি। তার ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছি। তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি ইত্যাদি। এ অভিযোগগুলোর জন্য এদের দোষ দেয়া যায় না। পত্রিকায় যা পড়বে তাইতো ওদের কথায় প্রতিফলিত হবে। ভারতের পত্রপত্রিকাগুলো তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। মাসের প্রায় ২৫দিনই এ মহিলা সংক্রান্ত কোন না কোন খবর বেরুবে। একবারতো The Pioneer' পত্রিকায় দেখলাম প্রথম পৃষ্ঠায় ছ'কলাম নিউজ। তাদের বললাম, 'তসলিমা নাসরিনকে আপনারা যেভাবে বড় করে তুলেছেন, বাংলাদেশে মোটেও সে তেমন বড় কিছু নয়। সাম্প্রতিককালে সে একটু সস্তা প্রচার লাভে প্রয়াসী হয়েছে। দেশের লোকেরা তাকে মূলত একজন পাগল হিসেবেই জানে। আর পাগলে কি না বলে? 'লজ্জা' উপন্যাসের প্রসঙ্গ তুললে বললাম, 'এ উপন্যাসের বর্ণনা কতখানি সত্য তা আমাদের দেশের হিন্দুদেরই জিজ্ঞেস করে দেখুন।' সত্যি, তিলকে তাল বানাবার ব্যাপারে এ মহিলার (?) জুড়ি নেই। '৯০ ও '৯২তে কিছুই যে হয়নি এদেশে তা নয়। কিন্তু 'লজ্জা'তে তসলিমা লজ্জাকর ভাষায় যা লিখেছে তাতে আমার তার প্রতি করুণাই হয়েছে।

তসলিমা নাসরিনকে এভাবে 'পাগল' বলে অভিহিত করায় কিছুটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন তাঁরা। আমাদের কথা ভাল লাগল কিনা জানি না, এ প্রসঙ্গে আর কথা তুললেন না। অন্যান্য খবর জিজ্ঞেস করলেন - বাংলাদেশে এবার দুর্গাপূজা হয়েছে কিনা, খালেদা জিয়ার সরকার কেমন পপুলার, আরও কত কি? এই 'বাঙালি বাবু'রা বাংলাদেশের রাজনীতির ব্যাপারে বেশি কৌতুহলী। কিন্তু আমি সেসব প্রশ্নের ধারে কাছেও যাই না। আমি ভারতে পড়তে এসেছি একটি কঠিন পণ করে। ভারতীয় ও বাংলাদেশী রাজনীতি দু'টোই এড়িয়ে চলবো। পড়াশুনা করতে এসেছি। তা ঠিকমত করেই দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাব। এসব রাজনীতি আমায় ভাত দেবে না। কেন বাবা, নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাব? সুতরাং 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' এই নীতি জিন্দাবাদ।

কাঠমুণ্ডুর পথে বাস ছাড়ল ৯টায়। ধীরে ধীরে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। বাসে আমি একেবারেই ঘুমাতে পারি না। বুঝতে পারলাম এ রাত জেগেই কাটাতে হবে। রাত জাগা হলেই আমার আবিদের কথা মনে পড়ে। আবিদও মিটফোর্ড হাসপাতালে ইন্টার্নি করছে। আমি দেশে গেলেই আমাদের ম্যারাথন রাত জাগা শুরু হয়। রাতে খেয়েদেয়ে গল্প শুরু

করি। কখন ফজরের আযান হয়ে যায় টেরই পাই না। আমি আলীগড় চলে আসলে রাত জেগে গল্প হয় না, কিন্তু চিঠি লেখা হয় কিই। আবিদ একবার ২৭ ফুট লম্বা চিঠি দিল আমাকে। পুরো চিঠিটা পড়তে আমার সময় লেগেছিল ৫ ঘন্টারও বেশি। তবে সে আমার কেমন বন্ধু তা প্রমাণ হয়ে গেছে আমার বই বের হবার সময়ই। আমার প্রথম বই 'বিশ্বের সেরা ক্রিকেট ও ক্রিকেটার' এর প্রকাশক আবিদ। আমি পাণ্ডুলিপি শেষ করে দিব্যি আলীগড় গিয়ে পড়াশুনা করতে লেগে গেছি। আর আবিদ দিনরাত একাকার করে, নাওয়া-খাওয়া ভুলে প্রকাশ করল বইটি। আবিদ ও বাবু। দু'জনের মধ্যেই একটা চারিত্রিক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। পরোপকার করতে গিয়ে নিজের বারটা বাজাতে এরা ওস্তাদ। আবিদকে নিয়ে আমি একটি ছড়া লিখেছিলাম। এটাই প্রমাণ করবে কেমন অদ্ভূত ছেলে সে -

"আবিদ ডাক্তার, ছোটখাট সাইজ তার
মিটফোর্ডে আছে পড়ে ভাইরে
আমার তোমার কাজ, এর কাজ ওর কাজ
কোন কাজে 'না' তার নাইরে।"

ভোর পাঁচটায় কাঠমুণ্ডু পৌঁছলাম। প্রচণ্ড শীতে কাঁপনি লেগে গেল। কাঠমুণ্ডু শহরটি সমুদ্র হতে সাড়ে চার হাজার ফুট উপরে, তাই স্বভাবতই তাপমাত্রা এখানে কম। শীতের কাপড় যথেষ্ট লাগিয়ে হাতে গ্লাভস পরেও ঠকঠক করে কাঁপছি। কিন্তু আমাদের হতবাক করে দিল দুটি মেয়ে। শর্টস ও গেঞ্জি পরে জগিং করে আমাদের পাশ দিয়ে গিয়ে সামনে এক মন্দিরের দেবীকে করজোড়ে প্রণাম করে আবার দৌড়ুতে আরম্ভ করল। ভাবটা এমন যেন গরমে আর শরীরে কাপড় রাখা যাচ্ছে না। এত ঠাণ্ডায় আমরা তিন তিনটি সুস্থ সবল যুবক যেখানে কাঁপছি সেখানে আমাদের রীতিমত বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করল এরা।

বাসায় পৌছে এই প্রথম দাদার সাথে দেখা হলো। সম্পর্কে দীপুর আব্বার চাচা হন ইনি। নাম ডা. মোঃ শামসুল ইসলাম। নেপালে WHO-এর গণসংযোগ অফিসার। বয়স ষাটের মতো হবে। বহু দেশ ঘুরে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিকে সমৃদ্ধ করেছেন। সেসব অভিজ্ঞতার বর্ণনাও খুব চমৎকার ফুটে উঠে তার মুখে। প্রসঙ্গক্রমে একবার কনকর্ডে করে যাত্রার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। সেবার নিউইয়র্ক থেকে লন্ডন যাবেন তিনি। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইট। পরদিন বিকলে তাঁর মিটিং আছে লন্ডনে। কিন্তু এয়ারপোর্টে পৌছে জানতে পারলেন

যান্ত্রিক অসুবিধার কারণে প্লেন পরদিন যাবে। ভীষণ ক্ষেপে গেলেন দাদা। পরদিনের কনফারেন্স কিভাবে ধরবেন? কর্তৃপক্ষ বলল, 'ভাববেন না। যে সময় ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ পৌঁছার কথা তার আগেই পৌছে যাবেন আপনি।' কনকর্ডে বুকিং দেয়া হলো দাদাকে। পরদিন সকালে দাদা কনকর্ডে চড়লেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ৬০,০০০ ফুট উপরে ওঠে গেল প্লেন। শব্দের চেয়েও দ্রুত গতিতে। প্লেনের ভেতর ডিসপ্লেতে দেখা যাচ্ছিল কিভাবে উষ্চতা ও স্পীড বেড়ে চলেছে। মাত্র সাড়ে তিন ঘন্টায় নিউইয়র্ক থেকে লন্ডনের হিথরো বিমান বন্দরে পৌছে গেলেন তিনি। দুর্লভ এক অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন দাদা।

নাস্তা করতে করতেই আলাপ হলো দাদার সাথে। খুব মজা পাচ্ছিলাম গল্প করে। কিন্তু দীপুর 'তাড়াতাড়ি' স্মরণ করিয়ে দিল আজ আমাদের নাগরকোট যাবার কথা। নাগরকোট যাবার উদ্দেশ্য এভারেস্ট দেখা। নেপাল এসে এভারেস্ট না দেখে যাব অতবড় বোকা নই আমরা। সুতরাং বিশ্রামের জন্য দেহের আবেদন থাকলেও তা প্রত্যাখ্যাত হলো। বরাবরের মতো হেঁটেই রওয়ানা হলাম ৪ কিলোমিটার দূরের ভক্তপুর বাসস্ট্যান্ডে। নাগরকোট যেতে হলে ভক্তপুর হয়েই যেতে হয়। একটার পর একটা পাবলিক বাস ভক্তপুর যাচ্ছে। সময় বাঁচাতে প্রথমটিতেই ওঠে গেলাম। আধা ঘন্টা দাঁড়িয়ে ভক্তপুর পৌঁছতে পৌঁছতে ১০টা বেজে গেল। কিন্তু সমস্যা দেখা গেল নাগরকোট যাওয়া নিয়ে। ভক্তপুর থেকে দিনে মাত্র দুটি বাস নাগরকোট যায়। পরবর্তী বাস আসবে বেলা দেড় টায়। এখন কি উপায়? ট্যাক্সি ভাড়া করা ছাড়া উপায় নেই। ওদিকে পকেট জানিয়ে দিল ৩০০ NC ট্যাক্সি ভাড়া দেয়া 'না মুনকিন' অর্থাৎ অসম্ভব। এমন সময় ত্রাণকর্তা হিসেবে এল এক ইংরেজ। ঠিক হল সে একা ১০০ এবং আমরা ২০০ দেব।

আমাদের সহযাত্রীটির নাম ড্যানিয়েল। ইংল্যান্ডের শেফিল্ডে তাঁর বাড়ি। বয়স ৩০/৩২ হবে। মিশরে এক তেল কোম্পানিতে চাকরি করে। একাই ঘুরতে এসেছে নেপাল। সাধারণত ইংরেজরা একটু নাক উঁচা প্রকৃতির হয়। কিন্তু ড্যানিয়েলকে বেশ মিশুক মনে হল। ট্যাক্সিতে বসে ভাব জমিয়ে ফেলল আমাদের সাথে। সুযোগ পেয়ে একটু খোঁচা দিলাম তাকে। ক্রিকেট ও ফুটবলে ইংল্যান্ডের দৈন্যদশার কথা উল্লেখ করলাম। শুধু অপেক্ষা করছিল বোধ হয় আমার প্রশ্নের। ইংল্যান্ডের ফুটবল ম্যানেজার গ্রাহাম টেইলারের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করল সে। ক্রিকেটের জন্যও দায়ী করল ম্যানেজার কীথ ফ্লেচারকে। তবে আর্থাটন ক্রিকেট

ক্যাপ্টেন হওয়ায় একটু আশাবাদী মনে হলো তাঁকে। তাঁর হতাশ ভাব দেখে ভাবলাম, হায় ইংরেজ। একদিন এসব খেলা তোমরাই আবিষ্কার করেছিলে। আজ তোমরাই পদে পদে অপদস্থ হচ্ছো বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে। 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করো তোমরা। তাই এ দুর্দশা তোমাদের প্রাপ্য।

সাড়ে এগারটা নাগাদ নাগরকোট পৌঁছলাম। ছোট্ট একটি উপশহর। একে এখানে Candle City' অথবা 'মোমবাতি নগর' বলা হয়। একটি বড়সড় মিলিটারি ক্যাম্প আছে এখানে। এই ক্যাম্প এবং দু-একটি বড় হোটেলে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও শহরের অধিকাংশ এলাকা সন্ধ্যা হলে মোমবাতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শুনেছি, ইচ্ছে করে নাকি এ ঐতিহ্য বজায় রেখেছে নাগরকোটবাসীরা।

নাগরকোট নেমে হিলটপে উঠলাম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি শুধু বরফের পাহাড়। পোখরার মতো এত কাছে থেকে দেখা যাচ্ছে না। তবে রেঞ্জ হিসেবে এটা বিরাট। এখন কোনটা এভারেস্ট এই নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম। আগেই শুনেছি এভারেস্ট অনেক দূর হওয়াতে বেশ ছোট দেখা যায়। আশে-পাশের লোকদের জিজ্ঞেস করলাম। ভালভাবে বলতে পারল না কেউ। শেষে নিজেরাই সচেষ্ট হলাম। হিমালয়ের যে চূড়াগুলো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে তার একটা ম্যাপ খুলে বসলাম। শুরু হলো আমাদের 'অপারেশন এভারেস্ট সার্চ।' প্রথমে চিহ্নিত করলাম লিভারসুবুগো চূড়া, যার উচ্চতা ৬,৬৯০ মি.। নাগরকোটের বেশ কাছাকাছি এটি। তাই বেশ বড় দেখা যাচ্ছে। এরপর তিনটি ছোট ছোট চূড়া দেখা গেল। তারপরই আবিস্কার করলাম বেশ দূরে একটা কালো মতো চূড়া। মিলে গেল হিসেব। এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গ আমাদের দেখা দিয়েছে।

মাউন্ট এভারেস্ট। সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। ভূ-পৃষ্ঠ ও অসীম শূন্যের মিলনস্থল। উচ্চতা ২৯,০২৯ ফুট অর্থাৎ ৮,৮৪৮ মিটার। এভারেস্ট অবশ্য এর প্রাচীন নাম নয়। 'Everest' নামক এক ইংরেজ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, এটিই পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। সেই থেকে এ শৃঙ্গটি এভারেস্ট নামে পরিচিত। এর প্রকৃত নেপালী নাম হচ্ছে 'সাগরমাথা'। এ নামের পেছনে একটি কিংবদন্তি আছে। অনেক বছর আগে নাকি এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সাগরের ভেতর থেকে এ শৃঙ্গটি ওঠে আসে। তাই একে বলা হয় 'সাগরমাথা'।

ড্যানিয়েল অন্যত্র গেছেন। আমরা তিনজন বসে আছি। উপরে নীল আকাশ। ১,৯৭০ মিটার উঁচু নাগরকোট থেকে বহু নিচে একটি ছোট্ট গ্রাম দেখা যাচ্ছে। গ্রামটি দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন ক্যারম-বোর্ডের

গুটি সাজিয়ে রেখেছে। আমাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে মেঘ। মেঘের শীতল স্পর্শ আমাদের রোমান্টিক করে তুলল। দীপু কেনেডি ভাইকে ধরল গান গাওয়ার জন্য। কিন্তু এই প্রথমবার কেনেডি ভাই গান গেয়ে খুশি করতে পারলেন না দীপুকে। পরিবেশের উপযোগী কোন গান বেরুচ্ছে না তার কন্ঠ থেকে। সুযোগটা নিলাম আমি। এ পর্যন্ত যতবারই আমি বাজিমাৎ করার চেষ্টা করেছি, ততবার আমি নিজেই 'কাৎ' হয়ে গেছি, অর্থাৎ চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু এবার সফল হলাম পুরোপুরি। 'এ' ডবল প্লাস পেয়ে গেলাম। মান্না দে'র সেই চমৎকার রোমান্টিক গানটি একেবারে সঠিক সময়ে মনে পড়েছে।

"যদি হিমালয় আল্পসের সমস্ত জমাট বরফ
একদিন গলেও যায়, তবুও তুমি আমার
যদি নায়েগরা জলপ্রপাত একদিন
সাহারার মতো হয়েও যায়, তবুও তুমি আমার।"

এই গানের দ্বিতীয় অন্তরাটি অসাধারণ

"যদি পৃথিবীকে ধ্বংস করতে একদিন তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধে
যদি নিভেও যায় কোনদিন যতটুকু আলো আছে
ঐ সূর্য্য আর চাঁদে
যদি সাইবেরিয়ার তুষারে কখনও
সবুজ ফসল ফলেও যায়। তবুও তুমি আমার।"

আমার গলা এমনিতে ফাঁটা বাঁশের মতো। একটি শিল্পীগোষ্ঠীর সাথে জড়িত ছিলাম বহুদিন। কিন্তু স্টেজ প্রোগ্রামই হোক আর স্টুডিওতে গান রেকর্ডিং-ই হোক, মাইক্রোফোন থেকে নিরপদ দূরত্বে দাঁড়াতে হতো আমাকে। সমবেত গানগুলো কোনমতে এভাবেই চালিয়ে নিতাম। কিন্তু আজ এভারেস্ট দর্শনে এসে আমার গলায় বোধ হয় মান্না দে স্বয়ং ভর করেছিলেন। তা না হলে এত ভাল গাইলাম কিভাবে? নিজের কানেই বিশ্বাস হচ্ছে না। দীপু ও কেনিডি ভাইও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি সালমানরুপী কোন ভূত কিনা তাই বোধ হয় নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছে। আড়চোখে দেখে নিচ্ছে আমার পা মাটি থেকে একহাত উপরে কিনা। যখন তাদের সন্দেহ দূর হলো, 'বাহবার' বন্যা বয়ে গেল। আমিও কেতাদুরস্ত ভঙ্গিমায় এই প্রথম পাওয়া আমার গানের প্রশংসা গ্রহণ করলাম। প্রশংসা প্রশংসাই। হোক না তা মাত্র দু'জন শ্রোতার জিহবা হতে উচ্চারিত।

অপলক নয়নে আমরা চেয়ে রয়েছি এভারেস্টের দিকে। আশেপাশে মেঘের উপস্থিতি জানিয়ে দিচ্ছে অচিরেই তারা সাদা নেকাবে ঢেকে দেবে 'সাগরমাথা' কে। অস্থির মন আমার আবার ডানা মেলল! উড়ে গেল পেছন দিকে।

২৯ মে ১৯৫৩। রৌদ্রকরোজ্জ্বল এক চমৎকার দিন। দুই দুৎসাহসী যুবক তরতর করে উপরে উঠে চলেছে। একজনের গায়ের রং সাদা। অপরজন বাদামী চামড়ায় আবৃত। নিউজিল্যান্ড অধিবাসী শ্বেতাঙ্গ যুবকটির নাম পরবর্তীতে 'স্যার' উপাধী পাওয়া এডমন্ড হিলারী। দ্বিতীয়জন 'তেনজিং নরগে নামক এক নেপালী বংশোদ্ভূত ভারতীয়। দু'জনের মুখেই তৃপ্তির হাসি। আর অল্পক্ষণ পরই তারা ইতিহাসের নয়া অধ্যায়ের সূচনা করবে। দীর্ঘ সংগ্রাম পাড়ি দিয়ে এসেছে তারা। ভয়ংকর ক'টা নিদ্রাহীন রাত কেটেছে। যে প্রতিকুল পরিবেশের কাছে হার মেনেছে অজস্র অভিযাত্রী, তাই জয় করল তারা আজ। তুষারপাত, পিচ্ছিল বরফ, আকাশচুম্বি উচ্চতা কোনটাই পারল না তাদের সংকল্পচ্যুত করতে। এভারেস্ট জয়ের দ্বারপ্রান্তে তারা।

বিজয়ের পতাকা পরিয়ে দেয়া হলো এভারেস্টকে। পরাজিত হতে বাধ্য হলো এভারেস্ট। বহু অভিযাত্রী হার মেনেছে তার কাছে। নিষ্ঠুর এভারেস্ট তাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে পরপারে। কিন্তু আজ সাগরের দু'পারের দুই অসীম সাহসী যুবকের কাছে হেরে গেল সে। 'সাগরমাথা'র মাথা চিরকালের জন্য নীচু হয়ে গেল সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের কাছে।

মেঘের রাজ্যে হারিয়ে গেল এভারেস্ট। আর আমরাও ফিরে চললাম। কি অদ্ভূত এই পৃথিবী। এতে আছে সাগরের গভীরতা, আছে পর্বতের দৃঢ়তা। আর আছে মানুষের মধ্যে দুটোকেই পরাজিত করার শক্তি ও সাহস। প্রকৃতির এ অপূর্ব লীলাখেলা দেখে মনে হয় যেন কেউ একজন কম্পিউটার গেম খেলছে এ বিশ্ব নিয়ে। কাজী নজরুল ইসলাম তাই লিখেছেনঃ

"খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে
বিরাট শিশু আনমনে।"

এর কি কোন শেষ আছে? কোন সীমা আছে কি এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের? যে প্রকৃতির কোন সীমা নেই কিভাবে কোন সীমায় আবদ্ধ থাকেন এর স্রষ্টা? অসীম তিনি। অসীম তাঁর সৃষ্টি। অসীম তাঁর মহিমা!

"যদি সাগরের জলকে কালি করি

আর গাছের পাতাকে করি খাতা

আর একে একে লিখে যাই মহিমা তোমার

তবু রইবে না একটিও পাতা।”

পাঠক! আমার ভাবাবেগের কারণে দয়া করে আমাকে দোষ দেবেন না। আপনারা যদি কখনও হিমালয়ের পাদদেশে আসেন তবে আপনাদের অবস্থাও আমার মতোই হবে। আমার মতোই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠবেন আপনারা। আমার মতোই আপনাদের কন্ঠ থেকেও উচ্চারিত হবে স্রষ্টার প্রতি প্রশংসার গানঃ

“শিল্পী তুমি হে রহমান নাই তুলনা যার

তোমার তুলির রং এর ছটায় জাহান একাকার।”

ভাগ্যজোরে অল্পের জন্য এভারেস্ট দেখতে পেয়েছি আমরা। আসলে এভারেস্ট দেখার জন্য এ সময়টা উপযোগী নয়। সময়ের স্বল্পতার কারণেই এ সময় আসতে হল আমাদের। এভারেস্ট দেখার জন্য নাগরকোট আসার শ্রেষ্ঠ সময় বিকেল। সূর্যাস্ত দেখে রাতে 'Candle City' নাগরকোটের সৌন্দর্য উপভোগ করে সকালে সূর্যোদয় দেখে তবেই নাগরকোট ত্যাগ করা উচিত। সকালে আকাশে মেঘ কম থাকায় পাহাড়ের রেঞ্জ ভাল দেখা যায়। ফলে এভারেস্টও ভাল দেখা যায়। সৌভাগ্যবশত ‘সাগরমাথা’ দেখতে পেলেও সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় এর রূপ কেমন হয় তা না দেখার বেদনা রয়েই গেল। একদিক দিয়ে অবশ্য ভালই হয়েছে। কিছু অপূর্ণ থাকা ভাল। সব ইচ্ছেই যদি পুরণ হয়ে যায় তবে পরবর্তীতে নেপালে আসার কোন আকর্ষণই হয়তো থাকবে না। এই ভেবে নিজেদের সান্ত্বনা দিলাম আমরা।

বন্দনা, মন্দনা

বহু ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য করে কাঠমুণ্ডুতে দাদার বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমরা সবাই এতই পরিশ্রান্ত যে আর কোথাও বের হবার চিন্তাই করলাম না। আর যেখানে দাদার মতো গল্প শোনাবার লোক আছেন, বাইরে যাবার প্রয়োজনই বা কি? তার উপর আছে কৃষ্ণার হাতের মজার রান্না। আজ কৃষ্ণা মুরগি রান্না করেছে। তার সাথে সব্জিও আছে। যেভাবে আমরা খেতে লাগলাম তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে আমরা তিনদিন না খেয়ে আছি।

পরদিন ২৯ অক্টোবর '৯৩। আগেই ঠিক করে রেখেছি আজ ও কাল কাঠমুণ্ডুতে বেড়িয়ে ৩১ তারিখ রওয়ানা হব শিলিগুড়ির পথে। চারদিন হলো নেপাল এসেছি। অথচ রাজধানীই দেখা হলো না এখনও। তাছাড়া কাঠমুণ্ডুতে দীপুর ক্লাসমেট আছে। মিটফোর্ড থেকে পাশ করেছে ওর সাথে। প্রথমজন 'মাত্রিকা' বাবার চিকিৎসার জন্য এখন মাদ্রাজ আছে। বাকি রইল দ্বিতীয়জন অর্থাৎ 'বন্দনা'। তার সাথে দেখা করতেই আমরা চললাম বীর হাসপাতালে, যেখানে সে ইন্টার্নী করছে।

বীর হাসপাতাল নেপালের অন্যতম আধুনিক হাসপাতাল। সুন্দরা বাসস্ট্যান্ডের উত্তর দিকে প্যারেড স্কোয়ারের বিপরীত দিকেই এ হাসপাতাল অবস্থিত। সেখানেই গেলাম বন্দনার সাথে দেখা করতে। দীপু আজ বেশ ফিটফাট হয়ে বেরিয়েছে। কেন তা টের পেলাম যখন বীর হাসপাতালের Gastroenterology ডিপার্টমেন্টে বন্দনার সাথে পরিচিত হলাম।

ডা. বন্দনা রাজভাণ্ডারী। চমৎকার শুভ্র-সুন্দর ভদ্র চেহারার এক নেপালী মেয়ে। লাল রং-এর প্রিন্টেড সালওয়ার কামিজের উপর সাদা অ্যাপ্রোন পরেছে। নেপালী মেয়েরা বেশ ফর্সা হয়। বন্দনাও তাই। তবে নাকটা সাধারণ নেপালী মেয়েদের তুলনায় অনেক খাড়া যা তার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। সব মিলিয়ে বন্দনাকে 'সুন্দরী' বলা যায় নির্দ্বিধায়। বন্দনার কথা আমি শুনেছি দেশে থাকতেই। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে বন্দনা বিখ্যাত ছিল তিনটি কারণে। প্রথমত, সে সুন্দরী। দ্বিতীয়ত, অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার তার। তৃতীয়ত, ভাল ছাত্রী হিসেবে। SSMC-এর ফার্স্ট গার্ল ছিল সে। এখনও যদি আপনি চৌদ্দতম ব্যাচের বন্দনার কথা জিজ্ঞেস করেন প্রশংসার

ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবে মিটফোর্ডের দেয়ালে দেয়ালে। এসব প্রশংসা ও তথ্য অবশ্য আমি দীপুর কাছ থেকেই পেয়েছি।

বন্দনা প্রথমেই হাসপাতালটি ঘুরিয়ে দেখাল। দীপু বেশ impressed হলো হাসপাতালটি দেখে। সিটিস্ক্যানসহ অনেক আধুনিক ব্যবস্থাদি আছে এ হাসপাতালে। দীপু বেশ মজা পাচ্ছে। সে ও বন্দনা হেঁটে চলছে পাশাপাশি। আমি ও কেনেডি ভাই পেছনে চলছি। স্বভাবতই দীপুর মতো এত স্ফুর্তি লাগছিল না আমাদের। ব্যাপারটা অনুধাবন করল বন্দনা। কয়েকবারই প্রশ্ন করল দীপুকে "I hope your friends are not getting bored।"

বন্দনা দীপুকে প্রথমেই একটা surprise দেবে বলেছিল। সেটা জানা হলো কিছুক্ষণ পরই। বন্দনার বাগদত্তা ডা. সাবীন জোশীর সাথে পরিচিত হলাম আমরা। অচিরেই বিয়ে করছে তারা। ডা. জোশী পাকিস্তানের বাহওয়ালপুর থেকে MBBS পাশ করেছেন। প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে গেল ভদ্রলোককে। যেমন গায়ের রং তেমন চেহারা। বন্দনার পাশে বেশ মানাচ্ছিল তাঁকে। যেন made for each other।

বন্দনার সাক্ষাৎ লাভের পর থেকেই দীপুকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। খুব দুষ্টুমি করছে মেয়েটির সাথে। এটা ওটা বলে ক্ষেপানোর চেষ্টা করছে। ডা. জোশীর সাথে পরিচিত হবার পর ওর মনের অবস্থা কি হলো তা অবশ্য কাউকে জানতে দিল না সে। হাসপাতালের ক্যাফেটরীয়ায় বসে চা খাবার সময় পরদিন তার বাসায় লাঞ্চের দাওয়াত দিল বন্দনা। ম্যাপ খুলে ঠিকানা বুঝিয়ে দিল। আমরা পায়ে হাঁটার রাস্তাটাই বুঝে নিলাম ম্যাপ দেখে। এরপর ওদের দু'জনের সাথে ছবি তুলেই রওয়ানা দিলাম মসজিদের দিকে। কারণ আজ জুমআর দিন। রওয়ানা হবার আগে বন্দনা বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল কাল দুপুর ১টার মধ্যে অবশ্যই যাতে পৌছে যাই ওর বাসায়। প্রত্যুত্তরে দীপু joke করে বলল, "We'll definitely reach there if the house exists at all"

বন্দনার সাথে যে দীপুর বেশ ভাল হৃদ্যতা মিটফোর্ডে ছিল তা সর্বপ্রথম প্রমাণ করে বন্দনাই। কাঠমুণ্ডুতে পৌছে দীপু ফোন করেছিল ওদের বাসায়। বন্দনা দীপুর গলা শুনেই চিনে ফেলেছিল। দীর্ঘ ৮ মাসের ব্যবধানে ওদের এ কথোপকথন। এছাড়া ওরা বাংলাদেশে টেলিফোনে এত কথাবার্তাও বলেনি। তারপরও পরিচয় পাবার আগে গলা চিনে ফেলা চাট্টিখানি কথা নয়। আর আজতো দীপুর কথাবার্তার ধরনই

প্রমাণ করল ব্যাপারটা। অবশ্য এ নিয়ে অন্য কিছু ভেবে বসা ঠিক নয়। ওরা সাত বছর ক্লাসমেট ছিল। স্বভাবতই এ সম্পর্কে নেহায়েৎ ভাল বন্ধুর সম্পর্ক। বন্ধুত্বের বাইরে কোন প্রশ্নই আসে না। অন্তত দীপু আমাদের তাই বোঝাতে চেষ্টা করেছে। আমরা তা বিশ্বাসও করেছি। [না করে কি উপায় আছে?] আপনারাও আশা করি তা বিশ্বাস করবেন। তবে আমি ভেবেছি অন্য কথা। বন্দনা ভিনদেশী এবং ভিন্নধর্মী না হল দীপুকে ঠেকিয়ে রাখা যেত কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

নেপাল এসে আজ অবধি মসজিদ চোখে পড়েনি। দরবার মার্গে গিয়ে দেখলাম অল্প ব্যবধানে দুটি মসজিদ রয়েছে। বিশাল জামাত হলো সেখানে। নেপালে এত মুসলমান আছে ভাবতেই পারিনি। আরও আশ্চর্য হলাম যখন মাইকে ভেসে এল উর্দু ভাষা। ইমাম সাহেব উর্দুতে বক্তব্য রাখছেন। বুঝলাম ভারতের মতো নেপালেও মুসলমানদের উর্দু চর্চা বেশ জোরালো।

সন্ধ্যায় বের হলাম মার্কেট ঘুরে দেখতে। নেপালে জিন্স ও কেডস নাকি বেশ সস্তা। তাছাড়া নেপালী টুপিও কিনতে হবে। টুপি ঠিকই কেনা হলো কিন্তু জিন্স, কেডস কেনা হলো না। দাদা আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, এখানে ঢাকার বঙ্গবাজারের প্রচুর চিন্স নতুন আঙ্গিকে বিক্রি করা হয়। ব্যাপারটা তাই মনে হলো। কাপড় ও দাম কোনটাই পছন্দ হলো না। কেডসের বাজারতো আগুন। শেষ পর্যন্ত দীপু একটা 'পাশমিনো' শাল কিনল ওর আম্মার জন্য। পাশমিনো হচ্ছে পাহাড়ী ছাগলের দাড়ি দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার শাল। খুব গরম ও আরামদায়ক হয় এগুলো। অবশ্য দীপু যেটা কিনেছে ওটা প্রকৃত পাশমিনো নয়। প্রকৃত পাশমিনোর অনেক দাম।

রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে হিসাব করতে বসলাম। এতদিন আমাকে দিয়ে হিসাব রাখিয়েছে এরা। একদিন শুধু দীপুকে দায়িত্বটা দিয়েছিলাম। তাতেই সে লেজেগোবরে করে ফেলে। ফলে পুনরায় আমাকেই এ কঠিন কাজটি চালাতে হয়। আজ আমি ও দীপু অনেক অনুরোধ করে দায়িত্বটা চাপালাম কেনেডি ভাইয়ের উপর। মাথার উপর থেকে বিরাট একটা বোঝা নেমে গেল যেন।

কিন্তু একটা বোঝা কিছুতেই নামাতে পারছিনা মাথা থেকে। আলীগড়ে আমার মাস্টার্সের ক্লাশ চলছে। ক্লাশ ফেলেই চলে এসেছি ঘুরতে। আল্লাহই জানেন আমার ডিপার্টমেন্ট চেয়ারম্যান কতটুকু ক্ষেপে

আছেন আমার উপর। তাঁকে বলে আসারও সুযোগ হয়নি। অনার্সে রেজাল্ট ভাল হওয়াতে আমার উপর শিক্ষকদের প্রত্যাশা বেড়ে গেছে বহুগুণ। সে প্রত্যাশা পূরণে আমার নাভিশ্বাস অবস্থা! কোন প্রশ্নের উত্তর আর কেউ না জানলেও আমাকে জানতেই হবে। কোন কাজ আর কেউ না পারলেও আমাকে পারতেই হবে। দারুণ স্নেহ করেন স্যাররা আমাকে। আমার ব্যক্তিগত ক্যারিয়ারের জন্য আমার থেকে তাদের চিন্তাই যেন বেশি। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকরাই ছাত্রদের সহযোগিতা করার জন্য আগ্রহ ভরে এগিয়ে আসেন। ভাল ও মনোযোগী ছাত্রদের বিশেষ যত্ন নেন তারা।

তাছাড়া আলীগড়ে আছি বেশ! জটিলতাহীন সহজ সরল জীবন যাপন। ইদানিং বাংলাদেশীদের আধিক্য যদিও কিছু টুকটাক ঘটনাবলির জন্ম দিয়েছে, কিন্তু আমি সেসব থেকে নিরাপদ দূরত্বেই আছি। এখানে বাংলাদেশীরা সুনাম ও দুর্নাম দুটোই অর্জন করেছে। প্রতি বছর একাধিক বাংলাদেশী বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করছে। কেউ কেউ ফ্যাকাল্টিতে প্রথম হয়ে গোল্ড মেডেলও পাচ্ছে। আবার কোনো কোনো বাংলাদেশী নকল করতে গিয়ে ধরাও পড়ছে। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী ছাত্র ফেন্সিডিল [যা আমাদের দেশে 'ডাইল' হিসেবে অধিক পরিচিত] খেয়ে জীবন ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কাশির ওষুধ ফেন্সিডিল খেয়ে যে নেশা হয় তা বাংলাদেশীরা আসার আগে আলীগড়বাসীরা জানত না। তবে বাংলাদেশীদের যে ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিকটু তা হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা। বিদেশীদের হোস্টেলে সিট না দেয়াতে ক্যাম্পাসের বাইরে বাসা ভাড়া করে থাকে সবাই। আর এ সুযোগে অবাধে চলে মেলামেশা। কে বাধা দেবে তাদের? স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করতে তাই কোন অসুবিধা নেই। এর মধ্যে বেশ কয়েক জোড়া তো রীতিমত 'লিভ টুগেদার' করে।

জাতিগতভাবেই আমাদের ধৈর্য একটু কম। তাই মাঝে মধ্যেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যায়। এ ঝগড়া হাতাহাতির পর্যায়ে যায়নি তাও নয়। অবশ্য এসব ঝগড়া-মারামারি একেবারেই অরাজনৈতিক। এই একটি ব্যাপারে আলীগড়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশীরা গর্ব করতে পারে। রাজনৈতিক সহনশীলতা এখানে চমৎকার। শুধুমাত্র বিভিন্ন দলের সমর্থকই নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ছেলে-মেয়েরাও রয়েছে এখানে। শহীদুল্লাহ কায়সারের ছেলে, অধ্যাপক

গোলাম আযমের ছেলে, সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজের ছেলে, রিজওয়ানুল হক চৌধুরীর ছেলে, সংগ্রাম সম্পাদ আবুল আসাদের ছেলে, সৈয়দ দিদার বখতের মেয়ে, রহমত আলী এম. পি'র ছেলে, কাজী কাদেরের নাতিসহ বহু রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর আত্মীয়-স্বজন পড়াশুনা করছে আলীগড়ে। কিন্তু এসব ভিন্ন মেরুর ছেলে-মেয়েরা যে পারস্পরক সৌহার্দ বজায় রেখেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। নোংরা রাজনীতি করে পরিবেশ নষ্টের চেষ্টা যে কেউ করেনি তা নয়। কেউ কেউ একাধিকবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটকের মাধ্যমে রাজনৈতিক উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তারা শুধু যে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়; বরং চরমভাবে অপমানিত হয়ে সকলের ঘৃণার পাত্র হয়ে আলীগড় ছেড়ে চলে গেছে। বর্তমানে প্রায় তিনশত বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী আলীগড়ে রাজনৈতিক সহনশীলতার এক চমৎকার নজির সৃষ্টি করেছে।

এমনিতে আলীগড়ের পরিবেশ চমৎকার। ভারতের অশিক্ষিত ও অবহেলিত মুসলিমদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরহুম স্যার সৈয়দ আহমদ খান ১৮৭৫ সালে 'মোহামেডান অ্যাংলা অরিয়েন্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। সেই কলেজটি তাঁর মৃত্যুর পর ১৯২০ সালে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। নাম হয় 'আলীগড় মুসলিম' বিশ্ববিদ্যালয়। শতকরা ৮৫% মুসলমানের দেশ বাংলাদেশে যদিও 'জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হল' থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আজও তার নাম ও ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। সারা ভারতের মুসলমানদের নয়নমণি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। মুসলমানদের যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে এর অবদান অপরিসীম।

ত্রীশ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রায় অর্ধশতাধিক ডিপার্টমেন্ট রয়েছে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর মধ্যে মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও রয়েছে। দু-একটি ছাড়া অধিকাংশ ডিপার্টমেন্টেই আন্ডারগ্রাজুয়েট পর্যায়ে সহশিক্ষা নেই। মেয়েদের জন্য এখানে রয়েছে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। দেয়াল দিয়ে ঘেরা সে ক্যাম্পাসেই তাদের হোস্টেল রয়েছে। সপ্তাহে শুধুমাত্র ছুটির দিন মেয়েরা আট ঘন্টার জন্য বের হতে পারে। আমাদের দেশের ক্যাম্পাসগুলোতে যে দৃশ্যটি অত্যন্ত স্বাভাবিক, অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় ছেলে--মেয়েদের দেখা যায় গল্পগুজব করছে, তা একোবেরই দেখা যায় না আলীগড়ে।

আলীগড়ে সবচাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে সীট সমস্যা। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্তেও সবাইকে সীট দিতে পারে না কর্তৃপক্ষ। ছেলেদের ১৩টি ও মেয়েদের দুটি হল রয়েছে। একটি হল নির্মাণাধীন। তারপরও সীট সমস্যা যাচ্ছে না। বিদেশীদেরতো হোস্টেল সরবরাহ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। তবে পড়াশুনার পরিবেশ এখানে চমৎকার। পড়াশুনা করার জন্য এর চাইতে অনুকুল পরিবেশ কোথাও পাওয়া যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এর নাম 'মাওলানা আজাদ লাইব্রেরী'। আটতলা বিল্ডিংটি বইয়ে ঠাসা। বড় বড় পাঁচটি reading room আছে। সকাল ৮টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এত ভীড় হয় যে জায়গা পাওয়াই মুশকিল হয়ে পড়ে।

আলীগড়ে বেশ কয়েকটি ডিপার্টমেন্ট অত্যন্ত উঁচুমানের। বিশেষ করে History ডিপার্টমেন্টটি শুধুমাত্র ভারতই নয়, এশিয়ার অন্যতম সেরা। এই ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ইরফান হাবিব মধ্যযুগীয় ইতিহাসে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, "যদি মধ্যযুগীয় ইতিহাস ও ভারতীয় ইতিহাসের সবগুলো বই এক সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলা হয়, তবে আমি এক সপ্তাহের মধ্যে তা হুবহু পুনরায় লিখে দিতে পারব।"

এক্সট্রা কারিকুলামে এই বিশ্ববিদ্যালয় অনেক উপরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অডিটরিয়ামটি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ফিল্ম ক্লাব, ড্রামা ক্লাব, মিউজিক ক্লাব সবই রয়েছে এখানে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র তারকা নাসিরুদ্দীন শাহ AMU Film Club-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। আমাদের রাইডিং ক্লাবটি এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো। ফুটবলে AMU উত্তর প্রদেশের জোনাল চ্যাম্পিয়ান। ক্রিকেটেও কম যায় না। এখানকার 'ওয়েলিংডন ক্রিকেট প্যাভিলিয়নটি' ভারতবর্ষে অনন্য। ভারতের প্রাক্তন হকি ক্যাপ্টেন ও বর্তমান কোচ জাফর ইকবাল AMU হকি দলের অধিনায়ক ছিলেন। আলীগড়ে তাঁর একটি বাড়িও আছে। জুনিয়র রোলার স্কেটিং-এ AMU অল ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ান। তাছাড় টেনিস, বাস্কেটবল, ভলিবল, সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স সব খেলাতেই আলীগড় সমৃদ্ধ। ইনডোর গেমসেও কম যায় না। আমাদের বিশাল জিমন্যাশিয়ামটি দেখার মতো। তাছাড়া প্রতিটি হলে রয়েছে বিলিয়ার্ডং টেবিল।

মুসলিম ঐতিহ্য মোটামুটি বজায় রয়েছে এখানে। বয়স, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সবাইকে সালাম দেয়। অধিকাংশেরই ব্যবহার বেশ ভাল। গায়ে পড়ে ঝগড়া করবে না। দলীয় রাজনীতি এখানে নিষিদ্ধ।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় ব্যক্তিগত পর্যায়ে। নির্বাচনের দু'দিন আগে সব প্রার্থীরা 'ইউনিয়ন হল' প্রাঙ্গণে এক মঞ্চে সর্বশেষ নির্বাচনী বক্তৃতা দেন। নির্বাচনের দিন প্রার্থীরা নিজস্ব হলের বাইরে যেতে পারেন না।

কিছু অদ্ভূত tradition আছে আলীগড়ে। শেরওয়ানী এখানকার অফিসিয়াল পোশাক। তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু কেউ যদি পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে তবে তার উপর শেরওয়ানী পড়তেই হবে। স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরে হলের বাইরে যাওয়া যাবে না। লুঙ্গি পরে রুমের বাইরে যাওয়া যাবে না। ছাত্ররা ঘোড়ার টাঙায় চড়তে পারবে না। সাইকেলে বেল লাগানো যাবে না। ছেলেরা ছাতা ব্যবহার করতে পারবে না। তবে তার ভৃত্য ছাতা ধরলে কোন অসুবিধা নেই। মোটকথা সবকিছুর মধ্যে একটা নওয়াবী ভাব থাকতে হবে। যদিও এসব লিখিতভাবে কোথাও নেই, তবুও সকল ছাত্র-ছাত্রী অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তা। না করে উপায় আছে? আপনি যে কোন একটি tradition ভাঙার চেষ্টা করে দেখুন! হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনতে পাবেন, 'পার্টনার, ইধার আও!' ব্যাস! হয়ে গেল আপনার। দিনে দুপুরে সবার সামনে আপনাকে বকাবকি করবে আর একটু পরপর বলবে, 'মুরগা বন্'। এভাবে 'মুরগা' বনার চাইতে সেসব tradition মেনে চলাই ভাল মনে করে সবাই। হোক না সেসব অদ্ভূত।

আলীগড় সম্পর্কে হাজারো চিন্তা আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে খেতে কখন যে অবসর গ্রহণ করল আর আমিও গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম তা টেরই পাইনি। দীপু এসে যখন লেপের কোণা ধরে হ্যাচকা টান দিল, তখন টের পেলাম যে ফজরের সময় হয়েছে। কেনেডি ভাইকে আগেই বলা ছিল। ফজরের পরপরই উনি তাঁর স্কেটিং-এর সরঞ্জামাদি বের করলেন। স্কেটিং করেই চলে গেলেন বাস টার্মিনালে টিকেট করতে। কাল বিকেলেই আমরা ছেড়ে যাব হিমালয়ের দেশ নেপাল।

কেনেডি ভাই যেতে না যেতেই আবার ঘুম দিলাম। এই দ্বিতীয় ইনিংসের ঘুমটি আমার খুব প্রিয়। আমার যেমন প্রিয়, আমার আব্বার ততোধিক অপ্রিয়। এই একটি ব্যাপারে আব্বার সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলাম। 'সকালের ঘুম শয়তানের ঘুম', 'সকালের ঘুম সারাদিনের কাজের বরকত নষ্ট করে' ইত্যাদি অনেক কথাই তিনি বলতেন। কতবার ওয়াদা করেছি সকালে না ঘুমোবার তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ফলাফল শূন্য। রাগে, বিরক্তিতে, অভিমানে আব্বা এখন আর কিছু বলেন না। আমার দৃঢ় আশা আব্বা তাঁর মহান হৃদয় দিয়ে আমার এ

অপরাধ ইতোমধ্যেই ক্ষমা করে দিয়েছেন, নয়তো অচিরেই ক্ষমা করবেন। আর যায় কোথায়? আব্বার ক্ষমা পেলে আল্লাহও মাফ করে দেবেন আশা করি।

কেনেডি ভাই টিকেট করে ফিরলেন ৭.৩০ মিনিটের দিকে। সাথে আনলেন চমৎকার একটি জ্যাকেট। নেপালীরা একে বলে 'বাটার ফ্লাই জ্যাকেট'। চেয়ে দেখবার জিনিস। আলীগড়ীয়ানদের ভাষায় একেবারে 'গজব'। দেরি করলাম না। আমি আর দীপুও কিনে ফেললাম একটি করে। এরপর তিনজনই একই রকম জ্যাকেট পরে বের হলাম কাঠমুণ্ডু শহর পরিদর্শনে। পায়ে হেঁটে অধিকাংশ জায়গায় গেলেও দূরবর্তী দু-একটি দর্শনীয় স্থানের জন্য অটো নিতেই হলো।

কাঠমুন্ডু ও রাজভান্ডারী পরিবার

কাঠমুণ্ডু শহরের ইতিহাস কয়েক'শ বছরের পুরনো। এর প্রাচীন নাম 'কান্তিপুর'। ষোড়শ শতাব্দীতে মল্লা পরিবারের শাসনকালে গোরাকনাথে বিখ্যাত কাঠমন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটির সংস্কৃত নামকরণ করা হয় 'কাষ্ঠমণ্ডপ'। একটি মাত্র কাষ্ঠখন্ড দ্বারা নির্মিত এ মন্দিরটি পরবর্তীতে প্রচুর পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐতিহাসিকদরে মতে, এ 'কাষ্ঠমণ্ডপ' হতে 'কাঠমুণ্ডু' নাম এসেছে।

সমুদ্র হতে ৪,৫৫০ ফুট উপরে ও ২৪২ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে নেপালের রাজধানী এই কাঠমুণ্ডু শহরটি চারিদিকে বরফের পাহাড় দেখা যায়। মনে হয় যেন সাদা পোশাকধারী এক বিশাল সৈন্যবাহিনী এই শহর রক্ষার দায়িত্বে সদা নিয়োজিত।

প্রথম গন্তব্যস্থল পশুপতিনাথ মন্দির। বাগমতি নদীর তীরে এ মন্দিটির দাদার বাসার কাছাকাছি। ললিতপুর শহর ও কাঠমুণ্ডুকে সংযুক্ত করেছে এ নদীটি। আর ললিতপুর শহরেই দাদার বাসা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা জয় শিং রাম দেবের সময় এ মন্দিরটি নির্মিত হয়। নেপালী স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন এই মন্দির। মন্দিরের উপরের অংশে সোনার পাত আছে। সম্মুখভাগে এক বিরাট ষাড়ের মূর্তি। চারিদিকে দেখা গেল বিভিন্ন ধরনের মূর্তি ও ছোটখাট বেশ কয়েকটি মন্দির।

এরপর আমরা হেঁটে চললাম রাজপ্রাসাদের দিকে। রাজা বীরেন্দ্র বীর বীক্রম শাহ এর বাসভবন ও কার্যালয় এখানে। ভেতরে ঢোকার জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের অনুমতি দেবে কে? আধুনিক স্থাপত্যে তৈরি এ সুদৃশ্য ভবনটি বাইরে থেকেই অপূর্ব লাগছিল।

হেঁটে হেঁটে ঘুরছি তাই সময়ও বেশি লাগছে। ১২.৩০ মিনিট বাজতে না বাজতেই দীপু অস্থির হয়ে উঠল। কোন কিছুতেই ওর মন নেই। বন্দনা যে পথ চেয়ে বসে থাকবে। ওকে কষ্ট দেয়ার মতো নিষ্ঠুর হৃদয় দীপুর নেই। ওর 'তাড়াতাড়ি'তে আমরা মাঝে মাঝে বিরক্তই হতাম। কিন্তু আজ বরং খুশিই হলাম। কেনেডি ভাইতো দারুণ উৎসাহী হয়ে দ্রুত হাঁটা শুরু করলেন। আমিও নেপালী হিন্দু পরিবারের সাথে লাঞ্চ করার অভিজ্ঞতা হবে ভেবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম।

বাসা চিনতে পারলাম সহজেই। বন্দনার বর্ণনা ছিল নিখুঁত। ওর চেহারার মতোই স্পষ্ট ও নিখুঁত। দূর থেকেই বাসা দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম বন্দনা দাঁড়িয়ে আছে জানালায়। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। আমাদের দেখেই হাত বাড়াল। দীপুও প্রত্যুত্তরে হাত দেখাল। ওদের সম্পর্কটা সত্যিই চমৎকার। দীপু বারেবারে এর ব্যাখ্যা দিয়েছে আমাদের সন্দেহমুক্ত করার জন্য। বাংলাদেশে অধ্যয়নের সময় অন্যান্য বিদেশীদের মতো বন্দনাও প্রায়ই অসহায় হয়ে পড়তো। আর মানুষের বিপদের বন্ধু দীপু এগিয়ে যেত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। এভাবেই ওদের হৃদ্যতা বেড়েছে। তবে এসব বিষয় নিয়ে দীপুকে খোঁচাতে ভালই লাগে। ও মাঝে মাঝে ক্ষেপে গেলে বেশি উৎসাহিত হই। ভ্রমণ কাহিনীতে বন্দনা নিয়ে ওকে যাতে বেশি না ঘাঁটাই তার অনুরোধ প্রথম থেকেই করেছে আমাকে। এই লেখা যখন লিখছি তখন কিছু অংশ সেন্সর করতেও বলেছে। আপনারই বলুন, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে তাঁর? লেখকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা ঠিক ঠিক?

তিন তলা বাসা বন্দনাদের। পুরোটা জুড়েই ওরা থাকে। প্রথমেই ড্রয়িং রুমে ঢুকলাম। রুচির পরিচয় পাওয়া গেল পুরো ঘরটা জুড়ে। সাজানো-গোছানো। ঘরোয়া পোষাকে বন্দনাকে আজ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। জলপাই রং-এর সালোয়ার কামিজের উপর ম্যাচিং করা ওড়না। তার শালীনতাবোধ প্রশংসনীয়। একটু পর একে একে আমরা পরিচিত হলাম বন্দনার বাবা, মা, বোন ও ভগ্নিপতির সাথে। চৎকার লাগল সবাইকে। আশ্চর্য হলাম তার মাকে দেখে। চল্লিশের মতো বয়স। ফুলহাতা ব্লাউজ পরে আছেন। আমাদের দেশের ক'জন মুসলমান মহিলা ফুলহাতা ব্লাউজ পরেন? যা হওয়া উচিত আমাদের সংস্কৃতি তা এরা পালন করছে। দীপুর কাছে আগেই শুনেছিলাম, বন্দনার পরিবার বেশ রক্ষণশীল। আজ চাক্ষুস প্রমাণ পেলাম।

বন্দনার বাবা শংকর বাহাদুর রাজভাণ্ডারী নিজেও পেশায় একজন ডাক্তার। ১৯৫৫ সালে কলকাতা মেডিকেল থেকে MBBS পাশ করেন। দীর্ঘ ১০ বছর তিনি জাম্বিয়াতে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বীর হাসপাতালের পাশে রেডিওলজির এক ক্লিনিকে বসেন। তাঁর সাথে কথা বলার সময় তাঁর অসীম পাণ্ডিত্যের নজির পেলাম। তিনি আমাদের কাছে নেপালের আদি ও বর্তমান অধিবাসীদের সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরলেন।

নেপালে বহু বংশ ও গোত্রের লোকেরা বাস করে। কিন্তু এদেরকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় - কিরান্তি, নেওয়ার ও প্রাভাতী। ভারত, তিব্বত ও মধ্য এশিয়া থেকে এদের আগমন। কিরান্তি জাতি চীন হতে সর্বপ্রথম নেপালে প্রবেশ করে।

নেওয়ার জাতি নেপালের সবচাইতে প্রাচীন এবং সংখ্যাতেও তারা সর্বাধিক। প্রকৃত নেপালী হিসেবে এরাই নিজেদের দাবী করে। শত শত বছর ধরে এরা নিজেদের কৃষ্টি, সভ্যতা, সাহিত্য, সুচারুরূপে সংরক্ষণ ও উন্নত করছে। আমাদের মেজবান রাজভাণ্ডারী পরিবারও এই নেওয়ার জাতির অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়, অর্থাৎ প্রাভাতী জাতিটি মূলত যোদ্ধা। এদের চারটি প্রধান গোত্র আছে। এরা হচ্ছে খাস, ঠাকুরী, গুরুঙ্গ ও গুর্খা। বর্তমান নেপালী রাজবংশ গুর্খা গোত্রের। কিন্তু যেহেতু নেওয়াররা নেপালের আদিবাসী, ফলে বরাবরই রাজপরিবার নেওয়ারদের সুযোগ-সুবিধা গুরুত্বের সাথে নিয়েছে।

নেপালের ভাষা প্রধানত নেপালী। তবে বেশ dialect ও এখানে প্রচলিত। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নেওয়ারী, মৈথিলি, ভোজপুরী ও মাগধী।

আরও কিছু হয়তো শোনাতেন বন্দনার বাবা। কিন্তু একটা কাজে উপরে যেতে হলো তাঁকে। মিসেস রাজভাণ্ডারীও গেলেন। আর সাথে সাথেই কথা ফুটল দীপুর। বন্দনার বাবার কথাগুলো আমি যেমন গোগ্রাসে গিলছিলাম, ওরা দু'জন ততটা মজা পায়নি। এখন উনি নেই। শুরু হলো দীপুর খোশ গল্প। বন্দনার প্রশ্নের জবাবে জানাল যে নেপাল এমনিতে ভাল তবে একটা কমপ্লেন আছে তার। কি সেটা কিছুতেই বলল না যদিও বন্দনা বারবার অনুরোধ জানাচ্ছিল। আসলে এটা ইচ্ছে করে ওকে ক্ষেপানোর জন্য দীপুর একটা কৌশল। আশাহত হয়ে আমাদের মতামত জানতে চাইল মেয়েটি। আমরা দু'জনই এক সঙ্গে বললাম Nepal is fantastic!" খুশি হল বেশ। আবার জিজ্ঞেস করল। What about the people?'

কি জবাব দেব বন্দনাকে? নেপালের লোকজন সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে আমাদের। সেই নেপালী ইমিগ্রেশনে ৫০০/= NC ঘুষ চাওয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তিক্ত ঘটনার সম্মুখীন যেমন হয়েছি, চমৎকার কিছু মানুষও তেমন দেখেছি। নেপালীরা খুব শান্তিপ্রিয়। হৈ-চৈ, গোলমাল, সন্ত্রাস সবই ওদের অপছন্দ। সহজ-সরল,

সুন্দর জীবন যাপন করবে তারা। ব্যবহারও ভারতীয়দের তুলনায় অনেক ভাল। যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে সেটা হলো, নেপালী জনগণের অসাম্প্রদায়িক মন-মানসিকতা। পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র নেপাল। অথচ ইতিহাসে এ দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নজীর নেই। পার্শ্ববর্তী 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতে প্রতিনিয়ত চলছে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কোন ধর্ম কখনও অন্য ধর্মকে আক্রমণ করার শিক্ষা দেয় না। এ ঘৃণ্য কাজটি করে ধর্মের লেবাসধারী এক ধরনের সুবিধাবাদী ও উস্কানিদাতা এক শ্রেণির অসৎ রাজনীতিবিদ। যদি কেউ সত্যিকার অর্থে কোন ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে, তবে তার মনে সাম্প্রদায়িক কোন চিন্তা ভুলেও বাসা বাঁধে না।

নেপালীদের যে জিনিসটি আমার সবচেয়ে বেশি খারাপ লেগেছে, তা হচ্ছে অতিরিক্ত মদ্যপান। নেপালের পান-বিড়ির দোকানে পর্যন্ত মদ পাওয়া যায়। আর এরা মদ খায়ও খুব বেশি। নেপাল বর্ডার থেকে কাঠমুণ্ডু যখন বাসে চলছিলাম তখন এক মাতাল হঠাৎ ওঠে যায় আমাদের বাসে। উল্টাপাল্টা বকাবকি ও অশ্লীল নাচ নেচে বাসের যাত্রীদের দূষিত করে ফেলে। মাতালটি এত মদ খেয়েছিল যে গন্ধে পুরা বাসের যাত্রীদের অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে। নেপালে যে কয়দিন থেকেছি, রাস্তা-ঘাটে, যেখানে-সেখানে এই মদের উৎকট ও অসহ্য গন্ধে প্রায়ই বমি হবার উপক্রম হয়েছে।

নেপালীদের সাথে কথা বলতে গিয়ে টের পেলাম ভারতীয়দের খুব একটা পছন্দ করেনা তারা। ভারতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তারা। তাই কিছু বলতেও পারে না। অপরদিকে ভারতের একচেটিয়া আধিপত্যও মন থেকে গ্রহণ করতে পারছে না তারা। আমাদেরকেও ভারতীয় মনে করে অনেকেই এড়িয়ে চলতো। কিন্তু বাংলাদেশী শোনার পর তাদেরকে দেখেছি বেশ আন্তরিকতার সাথে কথা বলতে।

বাসায় আসার পরপরই কোক ও কাজু বাদাম খাইয়েছে বন্দনা। কিন্তু সেসব হজম হয়ে খিদে কেবল লেগেছে, ঠিক সেসময়ই খবর এলো - খাবার রেডি। গেলাম দোতলায় ওদের ডাইনিং রুমে। গতকালই দীপু বন্দনাকে বলেছিল যে, যেহেতু আমরা হালাল না হলে গোস্ত খাই না তাই আমাদের সব্জি ও মাছ খাওয়ালেই চলবে। বেশ সমঝদার মেয়ে বন্দনা। কয়েক প্রকার সব্জি ও মাছ টেবিল ভরিয়ে রেখেছে। বন্দনাকে নিজ হাতে অন্তত একটি ডিশ তৈরি করতে হবে বলে দীপু জোর দাবী জানিয়েছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বন্দনা সালাদ প্রস্তুত করেছে নিজের হাতে। খাবার

খুব মজা লাগল। গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম সবাই। হিন্দুদের পাকানো সন্ধি খুব স্বাদের হয়। আলীগড়েও শুধু সন্ধি খাওয়ার জন্য আমরা মাঝে মাঝে হিন্দু হোটেলে যাই। যাই হোক, পেটুকের মতো খাচ্ছি। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেতে পারে দীপু। আর বন্দনাদের বাসায় খাবে বলে আজ সকাল থেকেই hunger strike শুরু করেছে সে। একই মুখ দিয়ে খাওয়া ও কথা একসাথে চালাচ্ছে। বন্দনার বাবা মা যাতে না বোঝে তাই বাংলাতেই দুষ্টুমি করছিল দীপু। সাত বছর বাংলাদেশে থাকায় বাংলা পুরোপুরি বোঝে বন্দনা। কিন্তু বাংলা বলেও সুবিধা হলো না তেমন। আর যখন বন্দনা দীপুর কানে কানে জানাল যে কলকাতা মেডিকেলে পড়ার সুবাদে ওর বাবাও কমবেশি বাংলা জানেন তখন বিব্রত দীপুর চেহারা দেখার মতো হয়েছিল। তবে দীপু বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পেরেছে সহজেই।

খাওয়ার পর আইসক্রীম এলো। আইসক্রীম খেতে খেতে গল্পও চলল। বন্দনা তার ছবির এ্যালবাম দেখাল। দীপুর অনুরোধে একটি লেমিনেটেড বড় ছবি দেখাল। ওদের ১৪তম ব্যাচের গ্রুপ ছবি। বাংলাদেশ ছাড়ার আগে দীপু প্রেজেন্ট করছিল বন্দনাকে। নিচে খুব সুন্দর একটা কথা লিখাঃ

"Make new friends, keep the old

These are the silver, those are the gold."

দীপু ও বন্দনার বন্ধুত্ব যে সত্যিই 'golden' তা উপলব্ধি করলাম। ইতোমধ্যে আমাদের দু'জনের সাথেও বেশ ভাল বন্ধুত্ব হয়েছে বন্দনার। যদি আমরা 'silver' হয়ে থাকি। তবে অবশ্যই দীপু 'gold'

নামাজের সময় চলে যাচ্ছে। বন্দনাকে অনুরোধ করাতে সানন্দে আমাদের নামায পড়ার ব্যবস্থা করল সে। জোহর ও আসর পড়লাম একসাথে। হিন্দু রাষ্ট্রের একটি হিন্দু পরিবারের বাসাতে আমরা তিনজন মুসলিম জামাতে নামাজ আদায় করলাম। আশ্চর্য বৈ-কি! সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক চমৎকার নজির সৃষ্টি হলো!

এবার বিদায়ের পালা। বিদায় জিনিসটাই বেদনার। সত্যিই খুব খারাপ লাগছিল চলে যেতে। অল্প সময়ে এ পরিবারটিকে কত আপন বলে মনে হলো। কি চমৎকার ব্যবহার! চমৎকার আতিথেয়তা।!

দেশ, জাতি, ধর্মের বিভেদ সত্তেও কি চমৎকার সৌহার্দপুর্ণ পরিবেশে কাটল কয়েকটি ঘন্টা! আমাদের এ স¤প্রীতি নজরুলের সেই বিখ্যাত কবিতারই প্রতিফলন ঘটালো যেনঃ

‘মোরা এক বৃন্তের দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান

মুসলিম তাহার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ।”

চলে আসব, এ মুহূর্তে বন্দনা আমাদের তিনজনের হাতে তিনটি প্যাকেট দিল। রাজভাণ্ডারী পরিবারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্বরূপ প্রত্যেকে gift পেলাম একটি করে চমকপ্রদ কারুকাজ করা ফটোফ্রেম। কি বলে ধন্যবাদ জানাবো এদের, ভাষা খুঁজে পেলাম না। এমনকি আমার ভাষাবিজ্ঞানের জ্ঞানও কোন কাজে আসল না। অন্তরের অন্তস্থল থেকে বেরিয়ে আসা একমাত্র একটি শব্দ "thanks" বলেই রওয়ানা হলাম আমরা বিষন্ন মনে। দীপুতো একেবারেই মনমরা হয়ে গেল। তিনজনই একমত হলাম, আমাদের ভ্রমণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিন কাটিয়েছি আমরা আজ।

কাঠমুণ্ডু দর্শনের সর্বশেষ গন্তব্য শম্ভূনাথ মন্দির। আমাদের তিন জোড়া পা এবং তিন হাতের তিনটি ঘড়ি জানিয়ে দিল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে অটো না নিয়ে উপায় নেই। নিলাম অটো। রওয়ানা হলাম কাঠমুণ্ডু শহর থেকে প্রায় ৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত শম্ভুনাথ বৌদ্ধ মন্দিরের দিকে। অটো চলছে তো চলছেই। মিটারের রিডিং যত বাড়ছে, আমাদের হৃদস্পন্দনও তার সাথে সাথে বাড়ছে। যখন মন্দিরের পাদদেশে নামলাম ৭০টি নেপালী মুদ্রা দিয়ে দিতে হলো নিতান্ত অনিচ্ছা সত্তেও।

প্রায় চারশ’র মত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হলো। বন্দনার বাসায় যা খেয়েছিলাম তার সবই বোধ হয় খরচ হয়ে গেল উঠতে গিয়ে। অভিভূত হয়ে গেলাম উপরে ওঠে। মূল মন্দিরটির পেছনে রয়েছে ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু প্রার্থনা চাকা [prayer wheel] বিশিষ্ট শীতলা দেবীর মন্দির। মূল বৌদ্ধ মন্দিরটি চমৎকার কারুকাজে পুর্ণ। বুদ্ধের প্রতিকৃতির মতো করে চোখ আঁকা রয়েছে চারিদিকে। যেন গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পাহারা দিচ্ছেন পুরো কাঠমুণ্ডু উপত্যকা। কাঠমুণ্ডু শহরের এক চমৎকার 'view’ পাওয়া যায় এখান থেকে।

আবার ৭০/= রুপী খরচ করে অটো নেয়ার ইচ্ছা হল না কারও। শর্টকাট রাস্তা ধরে হেঁটে গেলাম কাঠমুণ্ডু শহরের ‘দরবার স্কোয়ার’ এর দিকে। প্রাচীন রাজা-বাদশাদের প্রাসাদ, মন্দির সবই রয়েছে এখানে বেশ

বড় এলাকা জুড়ে। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তাই বেশিক্ষণ থাকা গেল না সেখানে।

নেপালে ছবি প্রিন্ট করা বেশ সস্তা। তাই আমাদের ভ্রমণের সব ছবি একসঙ্গে প্রিন্ট করিয়ে ফিরে গেলাম বাসায়। দাদা আমাদের বাইরে খাওয়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাত হয়ে যাওয়াতে তা সম্ভব হলো না। লক্ষ্য করলাম, সন্ধ্যা হলেই কাঠমুণ্ডু শহরটি প্রাণহীন নীরব হয়ে পড়ে। দাদার দৃষ্টিতে 'আলসের ঠাকুর' নেপালীরা আঁধার নামলে ঘর থেকে সহজে বের হয় না।

রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়েছি সকালে ভক্তপুর যাব বলে। নাগরকোট যাওয়ার সময় ভক্তপুর হয়ে গিয়েছিলাম। অথচ ভক্তপুর ঘুরে দেখা হয়নি। অনেকেই বলেছে নেপালের সবচাইতে প্রাচীন শহর ভক্তপুর অবশ্যই যাওয়া উচিত। বন্দনা তো জোর দিয়ে বলল, 'Don't leave Nepal before seeing Bhaktpur'। বন্দনা বলতে দীপুর আগ্রহ বেড়েছে। আর দীপুর আগ্রহ যখন বেড়েছে তখন না যেয়ে উপায় আছে? আজ বিকেলে বাস। সকালে কি করব? তাই ভক্তপুর ঘুরে আসাই ভাল।

পূর্বের মতো হেঁটে বাসস্ট্যান্ড গেলাম। ওখান থেকে মিনিবাস ধরলাম ভক্তপুরের। আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। বরফের glacier দেখা যাচ্ছে চারিদিকে। ভক্তপুর শহরের প্রাচীন নাম ভতগাঁ। কাঠমুণ্ডু থেকে সাত মাইল দূরে এ শহরটি মধ্যযুগে নেপালের রাজধানী ছিল। ৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে আনন্দ মল্লা এ শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভক্তপুর শহরের স্থাপত্য নিদর্শন ও নেওয়ার জাতির সভ্যতা, কলা প্রভৃতি এ দেশে দুটি ধর্মের যে অভূতপূর্ব মিশ্রণ রয়েছে তারই প্রমাণ বহন করে। ঐতিহাসিকভাবেই নেপাল হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম এমনভাবে মিশ্রিত হয়েছে যে অনেক সময় এ দুটোকে পৃথক করাই মুশকিল হয়ে পড়ে।

ভক্তপুরে দরবার স্কোয়ারের দিকে যাচ্ছি এমন সময় মিটফোর্ডে দীপুদের দুই ব্যাচ জুনিয়র এক গ্রুপের সাথে দেখা। পাঁচজন বাংলাদেশী ও তিনজন নেপালী। দীপুকে দেখেই তারা হৈ চৈ শুরু করল। তাদের কথাবার্তাগুলো অবশ্য একদিকেই, অর্থাৎ দীপুর মানিব্যাগের দিকেই এগুচ্ছিল। ঐ মানিব্যাগ থেকে ক'টা নেপালী মুদ্রা বের করে খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল তারা। কিন্তু দীপু বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের এড়িয়ে গেল।

এখানকার দরবার স্কোয়ারের মন্দির ও প্রাসাদ কাঠমুণ্ডু থেকে বেশ পৃথক ধরনের। একটা যাদুঘরও রয়েছে এখানে। অবশ্য সেটা মূর্তির

আধিক্যে পূর্ণ। ভক্তপুরের সবচাইতে বিখ্যাত মন্দির হচ্ছে 'ন্যাটাপোলা' অর্থাৎ পাঁচ তলা মন্দির। ১৭০৩ সালে এর প্রতিষ্ঠা হয়। প্যাগোডা স্টাইলে নির্মিত এ মন্দিরটি নেপালের অন্যতম উঁচু মন্দির। এখানে আরেকটি বিখ্যাত মন্দির হচ্ছে 'দওরিয়া' যেখানে 'শিবরাত্রি উৎসব' হয় প্রতিবছর।

বিদায় নেপাল

দু'ঘন্টা পরই ফিরে আসলাম ভক্তপুর থেকে। দেরি করলে না আবার বাস মিস্ করে ফেলি। ওদিকে বীর হাসপাতালে একবার যেতে হবে বন্দনাকে ওর সাথে তোলা ছবিটি পৌছে দিতে। বন্দনা থাকবে না তা অবশ্য আমরা জানতাম। শুধু ছবিটি পৌছে দেয়াই উদ্দেশ্য। যে ব্যাপারটি বন্দনা বহুবার জিজ্ঞেস করেও দীপুর কাছ থেকে জানতে পারেনি তাই জানিয়ে দিল দীপু আজ। নেপালের ব্যাপারে একটা কমপ্লেন আছে বল বন্দনাকে অস্থির করে তুলেছিল সে। তাকে আশ্বস্ত করার জন্য ছবির পেছনে লিখে দিল, "No complain! Really, I mean it!"

বাসায় ফিরেই শুরু হলো দীপুর 'তাড়াহুড়া'। মোটামুটি সময় মতোই গোসল, নামায ও খাওয়া সেরে ফেললম। কৃষ্ণার কাজে আমরা অত্যন্ত খুশি। তাকে ১০০ NC বখশীশ দিলাম। এরপর দাদার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ক'দিন আমাদের উপস্থিতিতে দাদার খালি বাসাটা বেশ সরগরম ছিল। আজ তা আবার নিস্তব্ধ হয়ে যাবে। এ কথাটাই বারবার উচ্চারণ করছিলেন তিনি। চমৎকার এ লোকটিকে একা রেখে যেতে খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু জীবনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই চলতে হবে আমাদের। অনেক কষ্টে দাদা তাঁর আবেগ সংবরণ করলেন। আমরাও কষ্টের হাসি হেসে বিদায় নিলাম তাঁর থেকে। অটো নিয়ে রওয়ানা হলাম ব্যাসস্ট্যান্ডের দিকে।

পোখরার পথে পরিচিত হওয়া সেই পাঁচজন বাংলাদেশীও আমাদের সাথে একই বাসে যাচ্ছে। বাস ছাড়ল পৌনে পাঁচটার দিকে।

৩১ অক্টোবরের এই চমৎকার বিকেলে কাঠমুণ্ডুর আকাশ মেঘশূন্য। সাদা পাহাড়ের যে প্রহরীগুলো কাঠমুণ্ডু শহরের প্রতিরক্ষায় স্বনিয়োজিত, গোধূলীর এ লগ্নে তারা যেন আমাদের বিদায়ী 'গার্ড অব অনার' দিচ্ছে। স্বপ্নের মতো একটি সপ্তাহ কেটে গেল নেপালে। ভারত তিন বছরে যা পারেনি, নেপাল মাত্র সাত দিনেই তা পেরেছে। আপন করে নিয়েছে আমাকে ও আমার দু'বন্ধুকে। নেপালের মাটি ও মানুষের সাথে মিশে গেছি, ভালবেসে ফেলেছি সবাইকে। পোখরার অন্নপূর্ণ রেঞ্জ, ফেওয়া লেক, বেগনাস লেক, ডেভিস ফল, মহেন্দ্র গুহা, নাগরকোটে এভারেস্ট দর্শন, কাঠমুণ্ডুতে মন্দিরসমূহ, সিংহ দরবার, রাজপ্রাসাদ, দরবার স্কোয়ার; ভক্তপুরে দরবার স্কোয়ার ও মন্দিরসমূহ সবই আমাদের চোখে ভাসছে। কাল রাতে প্রিন্ট করা ছবিগুলো দেখছি আর সেসব স্মৃতি-ই

রোমন্থন করছি। বিশেষ করে নেপালে দাদার আতিথেয়তা ও কৃষ্ণার রান্না কখনও ভুলব না। আর রাজভাণ্ডারী পরিবার? নেপাল ভাল লাগার পেছনে তাদের অবদান কি কম?

যতক্ষণ আলো ছিল, বরফের পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছিল। এখন সন্ধ্যা নেমেছে। ধীরে ধীরে আকাশের লাল আভাটুকুও মিলিয়ে গেল। অপূর্ব সুন্দর চাঁদের ঝলমলে আলো চারিদিকে পাহাড়-জঙ্গলকে স্বপ্নপুরীতে রূপান্তরিত করেছে। কিন্তু পূর্ণিমা চাঁদের দিকে তাকিয়েই মনে অদ্ভূত একটা বেদনা অনুভব করলাম। অপূর্ণতার অতৃপ্তি আমাকে পেয়ে বসল যেন। হ্যা! Something is missing! আবিষ্কার করলাম এই প্রথম আমার মনে একাকিত্বের অনুভূতি জাগ্রত হচ্ছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সচেতনতার সাথে নারী সান্নিধ্য এড়িয়ে চলেছি আমি। এর প্রয়োজনীয়তা যে আছে তাও তেমনভাবে বোধ করিনি কখনও। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে প্রতিটি পুরুষের জীবনেই একটি নারী প্রয়োজন। আজ অনুভূত হচ্ছে কেন প্রিয় নবীজি (স:) বিবাহের প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছেন। কেনেডি ভাই ও দীপু এখন কি ভাবছে জানি না। কেনেডি ভাই হয়তো সাম্প্রতিককালে দেশে ঘটে যাওয়া কিছু বিশেষ ঘটনাবলী অংক কষে হিসেব করে নিচ্ছেন। দীপু হয়তো আমার মতোই ভাবছে কেন আজও মনের মানুষ খুঁজে পেল না। আর আমি ভাবছি ভবিষ্যতের এক কাল্পনিক দৃশ্য। আজকের মতোই আমার পাশে থাকবে একটি নারী। যার সৌন্দর্যের তুলনা একমাত্র কাঞ্চনজঙ্ঘার সাথেই হতে পারে। আমার জীবনসঙ্গিনী। [যদি আদৌ তেমন কেউ থেকে থাকে] লজ্জাবনত মুখে বসে থাকবে। আর আমি গাইবঃ

"চাঁদনী রাত মে চাঁদকি সামনে
রুখ সে পর্দা হাটানা
গজব হো গায়া
চাঁদনী ছুপ গায়ী
চাঁদ শারমা গায়া
আপ কা মুসকুরানা গজব হো গায়া।"

অর্থাৎ 'এই জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের সামনে তোমার মুখ থেকে যখন তুমি নেকাব সরিয়ে ফেললে তখন সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেল। জ্যোৎস্না লুকিয়ে গেল! চাঁদ লজ্জা পেয়ে গেল! এরপর তুমি যখন মুচকি হাসলে তখন আরও বড় কিছু ঘটে গেল।"

কাঠমুণ্ডু যাওয়ার পথে যে তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম, এবার অবস্থা তার থেকে কিছুটা ভাল। সিটে বসে যেতে পারছি। বাঙালি ও আসামীদের হৈ চৈ শুনতে হচ্ছে না। আর ভাল খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে। কৃষ্ণা আমাদের জন্য ফ্রেঞ্চ টোস্ট বানিয়ে দিয়েছে পথে খাওয়ার জন্য, তাই খেলাম। এরপর আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে বাসে ঘুম পেয়ে গেল। কিন্তু রাস্তা বেশিক্ষণ ঘুমুতে দিল না। ভোর রাতে শুরু হলো সেই নাগরদোলা। ৫/৬ ঘন্টা চলল রাস্তার এই নিষ্পেষণ। রক্ষণাত্মক সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে কোন মতে এই 'বেচারা' দেহটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলো।

বিদায়ের সময় নেপাল অদ্ভূত মায়া সৃষ্টি করল। বরফের পাহাড় সেই যে কাল বিকেলে দেখা দিয়েছে, দৃষ্টির আড়াল হয়নি এখনও। এই বরফের glacier আমাকে কতটুকু অভিভূত করে তা বুঝে গেছে নেপাল। আর তাই এই মায়াজালে আবদ্ধ করছে আমাকে। নেপাল সীমান্তের শেষে এসে গেছি। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ছেড়ে যাব 'সাগরমাথার' এই অপূর্ব দেশটি। আবেগভরা হৃদয় নিয়ে নির্বাক দৃষ্টিতে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছি নেপালকে। আর কখনও এখানে আসা হবে কিনা কে জানে? আমার নিস্তব্ধতায় যেন নেপালের আকাশ-বাতাস গেয়ে উঠলঃ

"যাবার আগে কিছু বলে গেলে না
নীরবে শুধু রইলে চেয়ে
কিছু কি বলার ছিল না।"

না! আমার বলার কিছু নেই। নেপাল, তোমাকে কতটা ভালবেসেছি তা প্রকাশ করতে পারব না। তোমার এভারেস্ট, তোমার পোখরা, তোমার কাঠমুণ্ডু, তোমার ভক্তপুর এবং তোমার কোলের সেই অসাধারণ রাজভাণ্ডারী পরিবার - সবার প্রতি জন্মেছে আমার ভালবাসা। এ ভালবাসা না পারি লুকাতে, না পারি প্রকাশ করতে, না পারি বলতেঃ

"ছুপানা ভী নেহি আতা
জতানা ভী নেহি আতা
হামে তুমসে মুহাব্বত হ্যায়

বাতানা ভী নেহি আতা।"

বর্ডারে ইমিগ্রেশন, কাস্টমসসহ সব ঝামেলা চুকিয়ে যখন শিলিগুড়ি শহরে পৌঁছলাম তখন ১২টা বাজে। সেই যে কাল রাতে ফ্রেঞ্চ টোস্ট খেয়েছি তারপর এক প্যাকেট বিস্কুট ছাড়া কিছুই পেটে ঢোকেনি। সুতরাং 'সুজা' ঢুকলাম রেস্টুরেন্টে [দীপু সোজাকে সুজা বলে]। খাওয়া-দাওয়া সেরে গেলাম সেই মসজিদে যেখানে নেপাল রওয়ানা হবার আগে গিয়েছিলাম। আমাদের বাস সাড়ে সাতটায়। এতক্ষণ কি করব? মুসলমানদের জন্য সেরা মুসাফিরখানা হচ্ছে মসজিদ। সেখানেই বিশ্রামের মধ্য দিয়ে কাটল চারটি ঘন্টা।

ঠিক সময়েই ছাড়ল বাস। শিলিগুড়ি ছাড়তেও মন কেমন যেন করছে। এখান থেকে মাত্র তিন ঘন্টার রাস্তা দার্জিলিং। আহ্ যদি আবার যাওয়া যেত সেখানে? আবার এক পলক দেখতে পারতাম কাঞ্চনজঙ্ঘাকে?

সকালে কলকাতা পৌছে আবার উঠলাম নিউ সিটি লজে। কারণ এতদিন ঘুরে আমাদের পকেট 'গড়ের মাঠ' প্রায়। একটি টাকা বের করতেই হার্টবিট বেড়ে যায়। দীপুর কাছে অবশ্য কিছু টাকা আছে। কিন্তু তা 'শপিং' এর জন্য। নির্দিষ্ট হোটেলে গোছল করে পাশে নাজ রেস্টুরেন্টে খেয়েই বের হলাম। আজ অনেক কাজ। এর মধ্যে প্রধান কাজ হলো কেনেডি ভাই-এর ভিসা এক্সটেনশন করা। ইতোমধ্যে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তার। দেশে, আমাদের পাড়ারই ছেলে ওসমানের মামা (জানু মামা) সাহায্য করলেন কেনেডি ভাইকে। ভদ্রলোক খুবই helpful। নিজে দৌড়ে সব করে দিলেন। আর দীপুর শপিং-এ সাহায্য করলাম আমি। এভাবেই কেমন করে যেন খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল দিনটা।

পরদিন ৩ নভেম্বর। আজ বিদায় নেয়ার দিন। কেনেডি ভাই দেশে যাবেন বাই রোডে সকালে। দীপু দুপুরে চলে যাবে এয়ারপোর্ট। বিকেলে ওর ঢাকার ফ্লাইট। আর আমি সন্ধ্যার 'কালকা' মেলে রওয়ানা হব আলীগড়ের পথে। সকাল থেকেই তাই প্রত্যেকের মধ্যে বিষন্নতা পেয়ে বসল। কেনেডি ভাই-এর 'মুড' খারাপ হতে কমই দেখেছি। কিন্তু আজ তার মুখে সেই চেনা হাসিটি দেখতে পাচ্ছি না। দীপু ভুলে গেল তার সেই প্রিয় 'তাড়াতাড়ি' শব্দটি। আর আমিও হয়ে গেলাম একেবারে চুপ। ভ্রমণের জন্য এমন একটি চমৎকার গ্রুপ কয়টি দেখা যায়? সকল দিক থেকেই আমাদের গ্রুপটি ছিল অসাধারণ। তাই যে পরিকল্পনা আমরা

করেছিলাম কাঠমুণ্ডু বসে তা পূরণ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলাম আমরা। মাস্টার্স শেষ হবার পর আমরা বেরবো পাকিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তান ঘুরতে।

কেনেডি ভাইকে বিদায় দিলাম সকাল ১০টায়। তাঁকে বিদায় দেবার সময় আমার মনে পড়ল চার বছর আগের একটি দিনের কথা। সেদিন ভাইয়া বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে। আজ ভাইয়ারই সাথে অদ্ভূত চারিত্রিক সাদৃশ্যপূর্ণ কেনেডি ভাইকে ছাড়তে গিয়ে অনেকটা একই রকম শূন্যতা হৃদয়ে অনুভব করছি।

কেনেডি ভাইকে বিদায় দিয়ে আবার চিঠি লিখতে শুরু করলাম। দীপুর হাতে দিয়ে দিতে হবে। কাল রাত থেকে সেই চিঠি লিখা শুরু করেছি তার শেষ নেই। আব্বা, আম্মা, বাবু, শোভন, আবিদ, মল্লিক ভাই, রিপন, বায়জিদ, আদনান সবাইকে দু'কলম করে না লিখতে ভীষণ চটে যাবে আমার উপর।

দুপুরে খেয়েই দীপু রওয়ানা দিল এয়ারপোর্টের দিকে। ব্যাটা এত বেশি শপিং করেছে যে Airport Tax- এর ১৫০ রুপী ছাড়া ওর হাতে আছে মাত্র পাঁচ রুপী। বাসে করেই গেল। কিন্তু বাস থেকে নেমে রিক্সা ভাড়া বোধ হয় দিতে পারবে না। হেঁটেই যেতে হবে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত। দীপুকে ছাড়তে খারাপ লাগছিল বেশি। ছোটবেলার বন্ধু সে আমার। তাই সম্পর্কটা বড় বেশি গভীর। দীপু খুব আফসোস করছিল আমার জন্য। ওরাতো দেশে মায়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে। আর আমি? দেশের এত কাছে এসেও ফিরে যেতে হচ্ছে আলীগড়ে। দীপুর বাস যখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, বুকটা হাহাকার করে উঠল আমার।

সন্ধ্যা ৭টায় হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্ম ছেড়ে দিচ্ছে কালকা মেল। জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক'টি দিন অতিবাহিত করে আমি ফিরে চলছি একা। কেনেডি ভাইয়ের গান কানে আসছে না। দীপুর 'তাড়াতাড়ি' শুনতে পাচ্ছি না। শুধু নিজের একাকিত্বকে সঙ্গী করে চলেছি আমি। গজল সম্রাট মেহেদী হাসানের গানটি গুনগুনিয়ে উঠল আমার কণ্ঠেঃ

"তানহা থি অওর
হামেশা সে তানহা হ্যায় যিন্দেগী
ইয়ে যিন্দেগী কা নাম মাগার
কেয়া হ্যায় যিন্দেগী।"

ট্রেনে আমার আশেপাশে সবাই বাংলাদেশী। আমার মতো তারাও ট্যুরিস্ট কাউন্টার থেকে টিকেট কেটেছে। এর মধ্যে দু'জন যাচ্ছেন আজমীর। একজন মক্কায় হারাম শরীফের পাশেই ব্যবসা করেন। অপরজন মাওলানা। দু'জনের বাড়িই চট্টগ্রাম। ডান পা-হীন একজন পুঙ্গ মুক্তিযোদ্ধা জয়পুর যাচ্ছেন নকল পা ঠিক করতে। আর চতুর্থ বাংলাদেশী রহস্যজনকভাবে এড়িয়ে গেলেন কেন তিনি দিল্লী যাচ্ছেন সেই প্রশ্ন।

কারও সাথেই তেমন জমল না। মনটা আমার এতই বিষন্ন যে গল্পগুজব করার কোন চিন্তাই মাথায় এলো না। কলকাতার আমিনীয়া হোটেল থেকে চিকেন বিরানী এনেছি। তাই খেয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আসছে না কিছুতেই। বেশ কয়েকদিনের ঘুম জমা হয়ে আছে। অথচ এরপরও 'নিদ্রা' নামক আকাংখিত বস্তুটির সাক্ষাৎ ঘটল না। প্রচণ্ড একটি অস্থির ভাব মনের মধ্যে। আলীগড় যাবার পথে এত খারাপ আর কখনও লাগেনি। মনে হচ্ছে স্বর্গের টিকেট ফেল করে নরকের পথে যাত্রা করছি আমি।

৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার। দুপুর ১টা। কানপুর স্টেশন ছেড়ে দিল কালকা মেল। ট্রেনের 'প্যান্ট্রি কার'-এর খাবার খেয়ে উপরের বাঙ্কে শুয়েছি। আর পাঁচটি ঘন্টার রাস্তা বাকি। গতরাতের অস্থিরতা অনেকটা কাটিয়ে ওঠেছি। বিক্ষিপ্তভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো একসূত্রে গেঁথে গেল যেন। তৈরি হলো একটি মালা! সে মালা এখন আমার গলায়।

এক অদ্ভূত স্থানে দাঁড়িয়ে আছি আমি, দীপু ও কেনেডি ভাই। 'সূর্য' নামের লাল থালাটি ওঠে আসছে পূর্ব দিক থেকে। উত্তরে আমার 'প্রিয়তমা' কাঞ্চনজঙ্ঘা হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছে। পশ্চিমে 'সাগরমাথা' উঁচু করে দাঁড়িয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমাকে মহান প্রতিপালকের কথা। আর দক্ষিণে বিরাট জায়গা দখল করে অন্নপূর্ণ রেঞ্জ আমাদের আকর্ষণ করছে। আমাদের ডান পার্শ্বে একটি খাবার টেবিলে বসে দাদা আমাদের খেতে ডাকছেন। কৃষ্ণা গরম সব্জি ও ডাল টেবিলে রাখছে। বাঁ পাশে তাকিয়ে দেখি একটি সোফায় বসে আছেন ডা. ও মিসেস শংকর বাহাদুর রাজভাণ্ডারী। তাঁদের মাঝে বসে মুচকি হাসছে বন্দনা রাজভাণ্ডারী নামক চমৎকার একটি নেপালী মেয়ে।

'চায়ে পিও ভাই, চায়ে', 'এই মোমফালি', 'ভেজিটেবল কাটলেট' ... ফেরীওয়ালাদের চিৎকারে ঘুম ভাঙল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বিকেল পাঁচটা বাজে। নিচের ভদ্রলোকদের জিজ্ঞেস করে জানলাম, ট্রেন

‘হাথরস’ স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ আলীগড় আর মাত্র বিশ মিনিটের রাস্তা। তাড়াতাড়ি ওঠে, হাতমুখ ধুয়ে, রেডী হয়ে, বাংলাদেশী সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন কম্পার্টমেন্টের দরজায় পৌঁছলাম তখন ট্রেন আলীগড় জংশনের প্লাটফর্মে পৌছে গেছে। মাইক্রোফোন থেকে সেই পরিচিত আওয়াজ ভেসে এলো, “হাওড়া সে আ কার দিল্লী জানে ওয়ালে ২৩১১ আপ কালকা মেল আভি প্লাটফর্ম নম্বর তিন পার পৌঁছ চুকি হ্যায়----।” ফিরে এলাম আবার সেই আলীগড়ে। আবার শুরু হবে সেই জীবন। সেই জোহরা বাগ, দোধপুর, আমীর নিশান, স্যার সৈয়দ নগর! সেই আর্টস ফ্যাকল্টি! Linguistics ডিপার্টমেন্ট-লাইব্রেরি-ক্যান্টিন! সেই হটবাইট-ফানমাঞ্চ-কোয়ালিটি-মেজবান! সেই ইমরান-টিপু-তৈমুর-শিবলী-আপেল-মাহমুদ-খাজা-তুষার-রোমেলসহ বাংলাদেশীদের সাথে আড্ডা। আর---- অবশ্যই সেই ‘তারানা-এ আলীগড়:

“ইয়ে মেরা চমন ইয়ে মেরা চমন
ম্যাঁয়ে আপনি চমন কা বুলবুল হুঁ।।

***